লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৬ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮১ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ২১ রবি. আউ., ১৪৪০ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯৭ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১৮ ঈসাব্দ

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

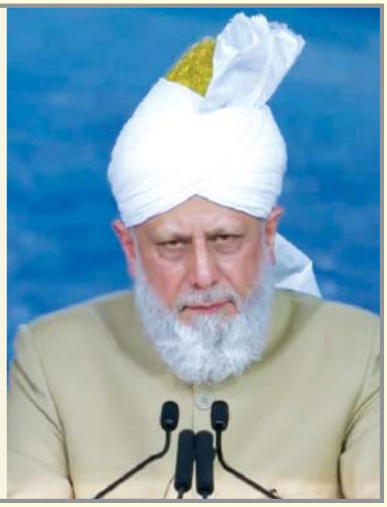

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ یَلِدْ ۙ وَلَمْ یُوْلَدْ ۝ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

ইসলামে রয়েছে– সার্বজনীন সহিষ্ণুতার শিক্ষা

ধর্মীয় সামগ্রিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে আজকাল এটাই দেখা যায় যে, ধর্মের অভ্যন্তরে একটা পরস্পর বিরোধী অবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণভাবে ধর্মের বাঁধন শিথিল তো হয়ে পড়ছেই সেই সাথে আবার অনেক ক্ষেত্রে শক্ত হতেও দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে ,প্রায় প্রতিটি ধর্মে এক প্রকার মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি আর প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু একটা মতাদর্শের তীব্র পশ্চাদমুখী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্ম পিছিয়ে পড়ছে। অপরাধ অবাধে সংঘটিত হচ্ছে। সত্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। সমতা এবং সুবিচার শূণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক দায়িত্বাবলী উপেক্ষিত হচ্ছে। একটি স্বার্থপর ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা শক্তি অর্জন করছে। কোন ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধগুলো সেই ধর্মের আত্মা এবং তার দেহ গঠন করে। কিন্তু সেই সকল মূল্যবোধের উপর ক্রমাগত ক্রিয়াশীল একটা শ্বাসরোধ-প্রক্রিয়া চলছে, যা অপরিহার্যরূপে ধ্বংসের পানে নিয়ে যায়।

ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ছাড়াও চরম অসুবিধা সৃষ্টিকারী ধর্মীয় গোঁড়ামীর পুণরুত্থান পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করে ফেলছে। এ এক নেশাকর আবহাওয়া; যা ধ্যান ধারণার অবাধ আদান প্রদান এবং আলাপ আলোচনার শুভ চেতনার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে আর স্বেচ্ছাচারি অসাধু রাজনীতিকরা এ জাতীয় উত্তপ্ত আবহাওয়াকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্যই সব সময় প্রস্তুত থাকে। যার কারণে ধর্মের আসল চেহারা কালিমাযুক্ত হয়ে পড়ছে। তদুপরি 'ফ্রি মিডিয়া' বা অবাধ নিরপেক্ষ গণমাধ্যমগুলো সাধারণভাবে মুক্ত থাকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অদৃশ্য হাতের দ্বারা,ফলে বিশ্বের এই নাজুক পরিস্থিতিতেও তারা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সুতরাং কোন দেশের গণ-মাধ্যম, সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখপাত্র হিসেবে অপর এক ধর্মের নিন্দা-বিদ্বেষের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে ধর্মই কলহ বিবাদের প্রথম শিকারে পরিণত হয়। এ দৃশ্য প্রকটভাবেই আজ পরিদৃষ্ট।

ধর্মের জগতে আজ পৃথিবীতে যা ঘটছে তা সত্যি সত্যিই উদ্বেগজনক। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্য থেকে ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য একটা সত্যিকারের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের একটা গভীর আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম এরূপ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সহকারে সেই কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম যাতে সম্পূর্ণরূপেই এসব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হতে পারে।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মের জন্য যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মের দ্বারা সার্বজনীনভাবে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ধর্মকে ধর্মীয় সার্বজনীনতা স্বীকার করতে হবে, এবং তা এই অর্থে যে, সকল মানুষ ধর্ম, গোত্র ও ভৌগলিক-পরিচয় নির্বিশেষে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অতএব, তারা সকলেই ঐশী নির্দেশ লাভের সমান অধিকারী। অবশ্য, তেমন ঐশী নির্দেশ যদি তাদের কারো প্রতি, মানব সমাজের কোনও অংশের জন্য, কখনও দান করা হয়। এতে করে সত্যের ওপরে কোন ধর্মের একচেটিয়া করণের যে ধারণা তা দূর হয়ে যাবে। সকল ধর্ম, তা সেগুলির নাম ও মতবাদ যাই হোক না কেন, সেগুলো যেখানেই পাওয়া যাক না কেন এবং যে যুগেরই হোক না কেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির কিছু না কিছু ঐশী সত্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। অধিকন্তু যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, মতবাদ এবং শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সব ধর্মই একটি অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। একই ঐশী কর্তৃত্ব বা অথরিটি, যা পৃথিবী কোন এক এলাকার এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার এবং অন্যান্য যুগের মানুষদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেরও তত্ত্বাবধান করেছে। এবং, এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমের মর্মবাণী।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন নবুওয়াতের সার্বজনীনতা নির্দেশ করে বলেছে–

"এবং নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছিলাম (এই শিক্ষাসহ) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চলো"। (১৬:৩৭)

অতএব, ইসলামের শাশ্বত এই শিক্ষাকে ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে মুসলমানদের নিরন্তর প্রচেষ্টারত থাকা উচিত।

সূচিপত্রে

৩০ নভেম্বর, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১ জুন ২০১৮ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি: ১৫
সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম হাসপাতাল ১৮
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

খলীফা আল্লাহ্ তা'লা বানান ২১
মাওলানা ফুরাদ আহমদ

খিলাফত: মানবজাতির জন্য এক আশীর্বাদ ২৩
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ২৬
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ২৯
দোয়া সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
লেখক: মোকাররম মাহমুদ মুজিব আযগর সাহেব।

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পরিণতি ৩১

কলমের জিহাদ ৩৩
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

বেদ ও বেদের দেবতাদের সম্পর্কে কিছু কথা ৩৬
খন্দকার আজমল হক

সংবাদ ৩৯

প্রচ্ছদ: **ছবিগুলো সংগৃহীত।**

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক
'আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে
'আহমদী' পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۱۰۰﴾

১০০। তারা কি জানে না, যে আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয় তিনি তাদের[১৬৫৬] মত (মানুষ) সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর তিনি তাদের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যালেমরা কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন অস্বীকার করলো।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۰۱﴾ ع

১০১। তুমি বল, 'তোমরা যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপাভান্ডারের মালিক হতে তবুও তোমরা (তা) খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অবশ্যই আঁকড়ে ধরে রাখতে। আর মানুষ বড়ই কৃপণ।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿۱۰۲﴾

১০২। আর আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন[১৬৫৭] দান করেছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে (সে অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করে দেখ। সে (অর্থাৎ মূসা) যখন তাদের (অর্থাৎ মিশরবাসীদের) কাছে এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল, 'হে মূসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿۱۰۳﴾

১০৩। সে বলেছিল, 'তুমি নিশ্চয় জেনে গেছ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালকই এসব দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফেরাউন! আমি তোমাকে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে করি।'

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿۱۰۴﴾

১০৪। সুতরাং সে দেশ থেকে তাদের উৎখাত করতে মনস্থ করলো। কিন্তু আমরা তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

১৬৫৬। এই আয়াতে মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব বা সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এক অকাট্য যুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের এখানে সরাসরি বলা হয় নি যে, যেহেতু আল্লাহ তা'লা তাদেরকে নতুন জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, সেহেতু তারা পুনর্জন্ম লাভ করবে। এই ধরনের কথা বলা হলে তা নিষ্ফল প্রমাণিত হতো। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে তারা যদি বিশ্বাস না করে তাহলে একইভাবে তারা এও অবিশ্বাস করতো যে, তারা এখন যেসব দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদেরকে গুরুত্বহীন এবং তুচ্ছ মনে করে তাদের নিকটেই অবিশ্বাসীদের ক্ষমতা ও মর্যাদার চরম পরাজয় ঘটবে। তাদের নিজেদের ধ্বংস এবং দুর্বল মুসলমানদের বিজয় ও ক্ষমতা লাভ– এই ভবিষ্যদ্বাণী আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও যথাসময়ে যদি তা সত্য প্রমাণিত হয় তবে মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে দাবি আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

১৬৫৭। উক্ত নয়টি চিহ্ন বা নিদর্শন কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা : (ক) ছড়ি বা লাঠি (৭:১০৮), (খ) শ্বেত হাত (৭:১০৯), (গ) ও (ঘ) অনাবৃষ্টি এবং ফলফলাদির ঘাটতি ও দুষ্প্রাপ্যতা (৭:১৩১), (ঙ) ঝড়-তুফান, (চ) পঙ্গপাল (ছ) উকুন বা তৎসদৃশ অন্যান্য কীট, (জ) ব্যাঙ এবং রক্তের শাস্তি (আমাশয় ইত্যাদি রোগ) (৭:১৩৪)।

হাদীস শরীফ

মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

"একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।"

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে-কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে , আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে-কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে-কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে) নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন; এবং যে-কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: মুসলমান সে, যে সাক্ষ্য দেয় 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে (সেই মুসলমানকে) হত্যা করা বৈধ নয়। এক-বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন-সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন: দুই বান্দা, একজন প্রাচ্যের এবং অপরজন পাশ্চাত্যের, যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবাসলে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদ– **মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ**
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী

নৈরাজ্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"নৈরাজ্যের উপ্‌চে-পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।"

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে, তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে, বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ-ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল-পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে তারা ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে, আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে, আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন, পতিত-বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে।

আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে, এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্‌চে-পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে, আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী-শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে, আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ভয়াবহ-নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। একে অন্যের বিরুদ্ধে এরা দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই হচ্ছি খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৮তম কিস্তি)

এখন আমি সত্যের তাকিদপূর্ণ এ উপদেশনামাটিতে এ বিষয়টি আপনাদের প্রত্যক্ষ করাতে চাই যে, কুরআন করীম তার অসাধারণ প্রমাণাদির মাধ্যমে (আল্লাহ্ নির্দেশিত) আমার দাবীর সত্যায়নে সক্রিয় এবং আমার বিরুদ্ধবাদীদের অসত্য ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটনে তৎপর। অতএব কুরআন করীম পূর্ববর্তী নবীদের (দৈহিকভাবে) দুনিয়ায় ফিরে আসার দ্বার রুদ্ধ করে এবং বনি ইসরাঈলের সদৃশদের (গুণগতভাবে) আগমনের দ্বার অবারিত করে। অতএব কুরআন করীমই এ দোয়া শিখিয়েছে: **"ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল্ মুস্তাকীম, সীরাতাল্ লাযীনা আন আম্‌তা আলাইহিম।"** এ দোয়ার মর্মবাণী তো এটাই যে, হে আমাদের খোদা! আমাদের তুমি নবী-রসূলদের সদৃশ বানাও। এ প্রসঙ্গে তিনি আবার হযরত ইয়াহ্ইয়ার সম্পর্কে বলেন: **"লাম নাজ আল্‌লাহু মিন কাবলু সামিইয়া।"** অর্থাৎ, ইয়াহ্ইয়ার পূর্বে আমরা তার কোন সদৃশ দুনিয়ায় পাঠাই নি– যাকে তার ঐসব গুণের দিক দিয়ে ইয়াহ্ইয়া নামে অভিহিত করা যায়। এ আয়াতটি পূর্বোল্লেখিত আমার বর্ণনার সত্যায়নে 'ইশরাতুন্নাস্' তথা কুরআনিক ভাষ্যের সমর্থনসূচক ইঙ্গিত বটে। কেননা খোদা তা'লা এস্থলে উক্ত আয়াতে 'পূর্ব' কথাটির শর্ত আরোপ করেছেন, পরবর্তী কালের শর্ত আরোপ করেন নি। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পরবর্তীকালে (আল্লাহ্ কর্তৃক) ইসরাঈলী নবীগণের নামে অভিহিত ব্যক্তিদের আগমনের দরজা খোলা রয়েছে। তাদের নাম খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ঐ নবীদের নামে হবে যাঁদের তাঁরা সদৃশ হবেন। অর্থাৎ যিনি মূসার সদৃশ হবেন তিনি মূসার নামে অভিহিত হবেন। যিনি ঈসার সদৃশ হবেন তিনি ঈসা-ইবনে-মরিয়ম নামে অভিহিত হবেন। উল্লিখিত আয়াতে খোদা তা'লা 'সামিইয়া' (তথা একই নামে অভিহিত) শব্দটি বর্ণনা করেছেন, 'মসিল' (সদৃশ) বলেন নি। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, খোদা তা'লার অভিপ্রায় হল, যে-ব্যক্তি কোন বনিইস্রাঈলী নবীর 'মসিল' বা সদৃশ হয়ে আসবেন তিনি 'সদৃশ' বলে অভিহিত না হয়ে বরং তাদের উভয়ের মাঝে পারস্পরিক মিল ও সামঞ্জস্যের কারণে সংশ্লিষ্ট নবীর নামে অভিহিত হয়ে আসবেন।

আর মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যু সম্পর্কে খোদা তা'লা যদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এমন শব্দ ব্যবহার করতেন, তাহলে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেটির অপব্যবহার করার সুযোগ থাকত। কাজেই খোদা তা'লা এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর জন্য যে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এ শব্দটি একথারও প্রমাণ বহণ করে যে, আত্মা চিরস্থিতিশীল এক বস্তু, যা মৃত্যুর পর খোদা তা'লার নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং মানবদেহের ওপর 'ফানা' বা নস্বরতা ছেয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মার ওপর (এর প্রভাব) পড়ে না। আর যেহেতু কুরআনের সর্বত্র 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি আবশ্যকীয়ভাবে উক্ত অর্থেই গৃহীত ও নির্দিষ্ট এবং কখনও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, সেহেতু উল্লিখিত অর্থটি কুরআন করীমের প্রাঞ্জল, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট ভাষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত। এটি অগ্রাহ্য করা ইলহাদ (বা খোদাদ্রোহিতা)-এর শামিল। কেননা এটা স্বীকৃত যে, **"আন্‌নুসূসু ইউহ্‌মালু আলা যাওয়া হেরিহা"** (অর্থাৎ ভাষ্যসমূহ স্বীয় বাহ্যিক অর্থেই গৃহীত হয়ে থাকে– অনুবাদক) ॥

অতএব আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ হযরত

মসীহ্‌র মৃত্যুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটিকে কুরআন করীম তেইশ (২৩)টি জায়গায় 'আত্মাকে কব্‌জ বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় হিসাবে ছেড়ে দেয়া'– এই একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ করে এমন খোলাসা করে দিয়েছে যে এ আলোচ্য বিষয়টিতে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে নি। বরং এ অর্থটি পবিত্র কুরআনের প্রথম পর্যায়ের প্রাঞ্জল, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট ভাষ্যের মধ্যে গণ্য হয়েছে। এটি এক অকাট্য ও সন্দেহাতীত বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে অবস্থিত। এটি অস্বীকার করাও চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।

এখন কুরআন করীমের উক্ত শব্দটির ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কেবল দু'টি পথই রয়েছে। তৃতীয় কোনো পথ নেই। (১) চিরস্থায়ীভাবে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দেহকে অকেজো বলে ছেড়ে দেওয়া। অন্য কথায়, একে মৃত্যু বলা হয়। (২) দ্বিতীয়ত স্বল্প সময়ের জন্য আত্মাকে কবজ করা বা নিয়ন্ত্রণে নেয়া। অন্য কথায়, একে নিদ্রাগমন বলা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে নিসন্দেহে এ শব্দটির অন্য কোনো অর্থের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। কেননা ঘমিয়ে পড়া এবং কিছুক্ষণ পর জেগে ওঠা একটা সাধারণ বিষয়। যতক্ষণ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণ তার আত্মা খোদা তা'লার কবজায় থাকে। আর যখন সে জাগে, তখন তার আত্মা (সক্রিয় অবস্থায়) তার দেহে ফিরে আসে– যাকে নিষ্ক্রিয় বলে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। খুব পরিস্কারভাবেই এ বিষয়টি বোঝা যায় যে, 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ দ্বারা দেহের সাথে কোনো সম্পর্ক ছাড়াই কেবল মানবাত্মাকে কবজায় বা নিয়ন্ত্রণে নেওয়া বুঝায়। বরং মানবদেহকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে ছেড়ে দেওয়া 'তাওয়াফ্‌ফি'-এর মর্মার্থে শামিল। এমতাবস্থায় খোদা তা'লা দেহকে নিয়ন্ত্রণে নেন বলে অর্থগ্রহণ করা– এর চেয়ে বেশী নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে? কেননা এ অর্থ সঠিক হয়ে থাকলে দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন করীমে অন্য কোথায়ও এরকম অর্থ বিদ্যমান থাকা উচিত। কিন্তু এই মাত্র আমি বিশদভাবে বর্ণনা করে এসেছি যে, দেহের সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখে কেবল আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া এবং দেহকে অকেজো স্বরূপ ছেড়ে দেওয়া তাওয়াফ্‌ফি শব্দটির কেবল এ অর্থই কুরআন করীম আদ্যপান্ত সব জায়গায় গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু হযরত মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যুর ক্ষেত্রে যদি আমরা (ঘুম সম্পর্কিত) দ্বিতীয় অর্থটি বোঝায় বলে ধরে নেই, তাহলে এর সার্বিক অর্থ এই দাঁড়াবে যে, হযরত মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়ম কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকেন, তারপর জেগে যান। এতে করে তো এটা প্রমাণিত হয়ে যায় না যে, তার দেহ আকাশে উঠে গেছে। যারা রাতে বা দিনে ঘুমায় তাদের দেহ কি আকাশে ওঠে যায়?! আমি এইমাত্র বর্ণনা করে এসেছি যে, ঘুমন্ত অবস্থায় কেবল অল্প একটু সময় পর্যন্ত আত্মাকে কবজ বা ধারণ করা হয়, দেহকে ওঠানোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখনই আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, কুরআন করীমের প্রাঞ্জল, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট ভাষ্যসমূহ 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটিকে কেবল আত্মা পর্যন্তই সীমিত রেখেছে অর্থাৎ মানবাত্মাকে কবজ (ধারণ) করা এবং তার দেহকে অকেজো হিসাবে ছেড়ে দেয়া। এমতাবস্থায় 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি থেকে আবার এ অর্থ বের করা যে, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্‌র কেবল আত্মাকেই নিজের দিকে উঠিয়ে নেন নি, বরং তাঁর পার্থিব দেহও সেই সাথে উঠিয়েছেন– এটা কত মারাত্মক অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণা?! যা পবিত্র কুরআনের প্রাঞ্জল প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট ভাষ্যের পরিপন্থী। কুরআন করীম একবার নয়, দুইবার নয়, বরং পঁচিশ বার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাওয়াফ্‌ফি শব্দটিতে কেবল আত্মাকে কবজ বা ধারণ করা বুঝায়, দেহের সাথে মোটেই এর কোনো সংস্রব নেই। এরপর এখনও যদি কেউ না মানে তাহলে পবিত্র কুরআনের সাথে তার কী সম্পর্ক? তার সম্পর্কে তো পরিষ্কারভাবে বলা উচিত যে, সে তার কল্পিত কতক বুযুর্গের রেখাকে কোনো অবস্থায়ও ছাড়তে চায় না।

অতঃপর, কুরআন করীমের পরেই হাদীসাবলীর স্থান। অতএব, প্রায় সমগ্র হাদীস বিশদভাবে কুরআন করীমেরই বর্ণনা সম্মত। এ মর্মে লেখা এমন একটি হাদীসও নেই যে, বনি ইস্রাঈলী নবী মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়ম– যার ওপর ইঞ্জিল নাযেল হয়েছিল যাঁকে কুরআন করীম মৃত বলে সাব্যস্ত করেছে, তিনি পুনরায় দুনিয়ায় আসবেন। তবে বিশদভাবে লেখা আছে যে, এই ইস্রাঈলী নবীগণের নামে অভিহিত তাদের সদৃশ আসবেন। এটাও সত্য যে, হাদীসাবলীতে 'ইবনে-মরিয়ম-আসবেন' বলে লেখা আছে। কিন্তু এ সকল হাদীসেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় মসীহ্‌র অবয়ব ও দৈহিক গঠনে ভিন্নতা বর্ণনা করে এবং আগমনকারী মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়মকে 'উম্মতি' (অর্থাৎ মুসলিম উম্মতের মধ্যকার একজন সদস্য) আখ্যায়িত করে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, এ (আগমনকারী) 'ইবনে-মরিয়ম' ভিন্ন ব্যক্তি হবেন। এ ধরণের বিবাদমান হাদীসের ব্যাখ্যায় অন্যান্য হাদীস দ্বারা সাহায্য নিতে চাইলে এমন একটি হাদীসও খুজে পাওয়া যায় না, যাতে প্রমাণিত হয় যে বিগত নবীগণের মধ্যকার কোনো একজনও পুনরায় আসবেন। তবে এটা বরং প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের 'মসীল' বা সদৃশ আসবেন এবং তাঁদেরই নামে অভিহিত হবেন।

আর এ বিষয়টি আমি কয়েকবারই লিখে এসেছি যে, খাতামুন্নাবাঈন (সা.)-এর পরে বনি ইস্রাঈলী (স্বতন্ত্র-স্বাধীন) নবী মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়মের আগমন ভীষণ বিভ্রাটের কারণ। কেননা এতে করে হয়তো এটি মানতে হবে যে, নবুওয়াতের ওহী পুনরায় জারি হবে। নয়তো স্বীকার করতে হবে যে, খোদা তা'লা মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়মকে নবুওয়াতের গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে কেবল একজন 'উম্মতি' করে পাঠাবেন। বস্তুতপক্ষে এ উভয় অবস্থাই অন্তরায় ও অসম্ভব বটে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অব.)

জুমুআর খুতবা

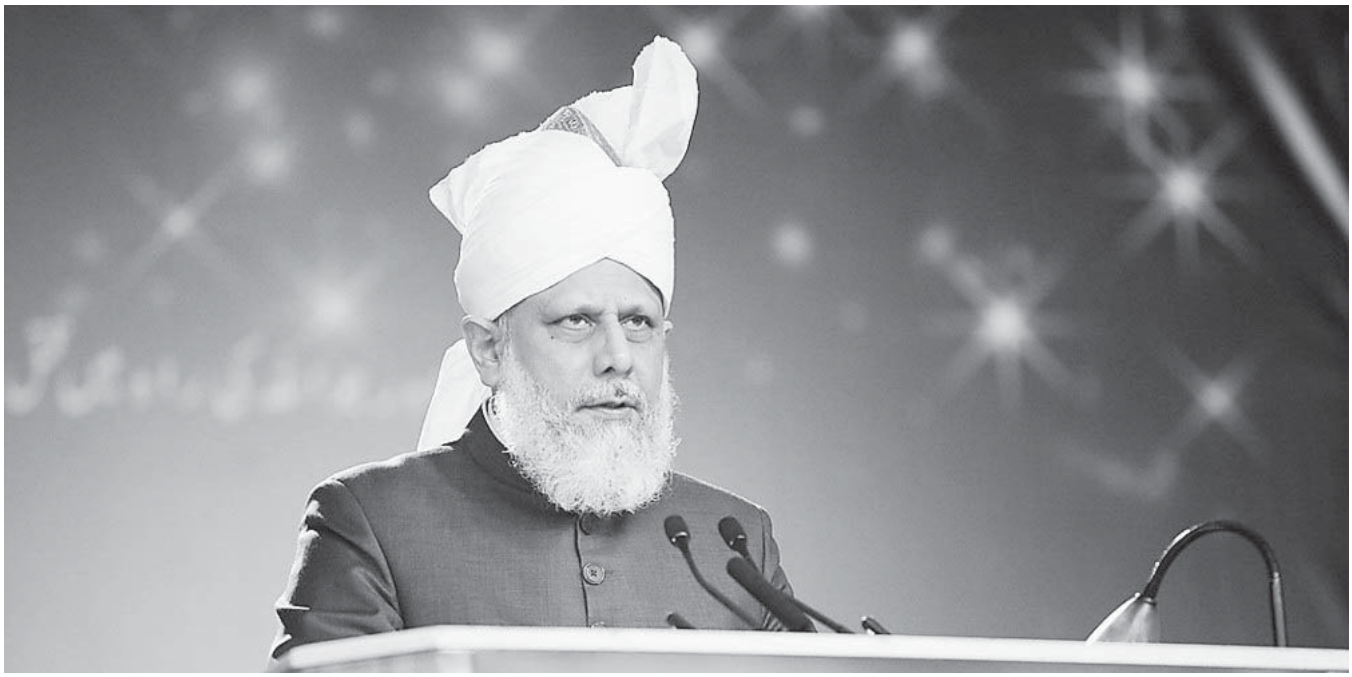

সাহাবী (রা.): কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১ জুন ২০১৮'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উকাশা বিন মিহসান মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত উকাশাবিন মিহসান জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্যহন। বদরের যুদ্ধের সময়তিনি অশ্বারোহী হিসেবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।(যুদ্ধের) সেদিন তার তরবারি ভেঙে যায়, তখন রসূলে করীম (সা.) তাকে একটি কাঠের টুকরা দেন যা তাঁর হাতে অনেক ধারালো এবং নিখাঁদ লোহার তরবারি সদৃশ হয়ে যায় আর তিনি সেটি দিয়েই যুদ্ধ করেন যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা বিজয় দান করেন। পরবর্তীতে এই তরবারি নিয়েই তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আর এই কাঠের তরবারিটি আমৃত্যু তাঁর কাছেই সংরক্ষিত ছিল। সেই তরবারির নাম ছিল 'অওন'। রসূলে করীম (সা.) তাঁকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫, উক্কাশা বিন মিহসান, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)

বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আরবের সর্বোত্তম অশ্বারোহী আমাদের সাথে আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি কে? তিনি (সা.) বলেন 'উকাশা বিন মিহসান'। (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৩৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার আর তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উকাশা বিন মিহসান তখন নিজের চাদর উচিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

এরপর আনসারদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, 'সাবাকাকা বেহা উকাশা' অর্থাৎ এই বিষয়ে উকাশা তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: আদ দালিলু আলা দুখুলি তাওয়ায়িফি মিনাল মুসলিমিনাল জান্নাতা বেগাইরি হিসাবিন ওয়ালা আযাবিন, হাদীস নং:৩৬৯)

এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সাহেব তার 'সীরাত' গ্রন্থে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় লিখেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে একবার এই কথা উঠে, যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক কোন হিসেব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা আধ্যাত্মিতার এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন আর তাদের জন্য ঐশী দয়া ও কৃপা এত বেশি উদ্বেলিত হবে যে, তাদের কোন প্রকার হিসাবের প্রয়োজন হবে না। তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, তাদের চেহারা কেয়ামতের দিন এমনভাবে ঝলমল করবে যেভাবে চতুর্দশী চাঁদ আকাশে ঝলমল করে। তখন হযরত উকাশা বলেন যে, আমার জন্যও দোয়া করুন; আর তিনি (সা.) দোয়া করেন, (হে আল্লাহ) একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। এই পুরো ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেন যে,রসূলে করীম (সা.)-এর বৈঠকের আপাত এই ছোট ঘঁটনাটি নিজের মাঝে তত্ত্বজ্ঞানের এক ভাণ্ডার অন্তর্নিহিত রাখে। প্রথমত এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া আল্লাহ্ তা'লার এত বেশি দয়া ও কৃপাধন্য আর মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্বের এমন পর্যায়ে উপনীত যে, তাঁর উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক এমন হবেন যারা নিজেদের দেদীপ্যমান আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং খোদা তা'লার বিশেষ দয়া ও কৃপাগুণে কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশ-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার উর্ধ্বে থাকবে। (সত্তর হাজার দ্বারা এক বৃহৎ সংখ্যাও বুঝাতে পারে)। দ্বিতীয়ত এ থেকে এ বিষয়টিও জানা যায় যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এতটা নৈকট্য রাখেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষনাৎ কাশফ বা ইলকার মাধ্যমে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেছেন যে, উকাশা সেই সত্তুর হাজারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন। অথবা এটিও হতে পারে যে, উকাশা ইতিপূর্বে এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না কিন্তু তাঁর (সা.) দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই সম্মান দান করেছেন। তৃতীয়ত এই ঘটনা থেকে এটিও জানা যায় যে, মহানবী (সা.) খোদা তা'লার সম্মানের প্রতি অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন আর তিনি তাঁর উম্মতের মাঝে চেষ্টা-সাধনার রীতিকে এত বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন যে, উকাশার পর দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে একই দোয়া করার অনুরোধ করলে তিনি সেই সবিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা দৃষ্টিতে রেখে, যা সেই পবিত্র লোকদের লব্ধ ছিল, একক অন্য কোন ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তাকওয়া, ঈমান এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, এদিকে দৃষ্টি থাকলে তোমাদের জন্য এই মর্যাদা লাভ করা সম্ভব। চতুর্থত এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর অনুপম উন্নত চরিত্রের বিষয়টিও দিবালোকের ন্যায় ফুঁটে ওঠে। কেননা তিনি (সা.) এমনভাবে অস্বীকার করেন নি যার ফলে দোয়াপ্রার্থী আনসারী মনে কষ্ট পেতে পারতো বরং খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যান। [সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, লেখক হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.), পৃ. ৬৬৭-৬৬৮]

মহানবী (সা.) হযরত উকাশাকে বিভিন্ন 'সারিয়া'য় [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অংশগ্রহণ না করা যুদ্ধাভিযানে] বা যুদ্ধে প্রেরিত বাহিনীর আমীর বা সেনাপ্রধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত উকাশাকে ৪০জন মুসলমানের দলপ্রধান হিসেবে বনি আসাদ গোত্রের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্রের বসতি ছিল একটি ঝর্ণার কাছে , যার নাম ছিল গামার, যা মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উকাশার বাহিনী ক্ষিপ্রতার সাথে সফর করে সেখানে পৌঁছে যায় যেন তাদেরকে দুস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা যায়। প্রকাশ পায় যে, এই গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। তখন উকাশা এবং তার সঙ্গীসাথিরা মদীনায় ফিরে আসেন আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। [সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, লেখক হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.), পৃ. ৬৬৬]

আপত্তি করা হয় যে, এদের অর্থাৎ মুসলমানদের বিনা কারণে যুদ্ধ করার শখ ছিল, অথচ তারা এদের সাথে বিনা কারণে যুদ্ধ করার কোন চেষ্টা করেন নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন সূরা 'আল-নাসর' অবতীর্ণ হয় তখন তিনি (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। নামাযের পর তিনি (সা.) একটি খুতবা প্রদান করেন যা শুনে মানুষ অতিশায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে লোক সকল! আমি কেমন নবী? তারা উত্তরে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিন, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আপনি আমাদের জন্য দয়ার্দ্র পিতার ন্যায় এবং স্নেহপরায়ণ ও সদুপদেশদাতা ভাইয়ের তুল্য। আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং তাঁর ওহী পৌঁছিয়েছেন আর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আমাদেরকে নিজ প্রভুর পথ-পানে আপনি আহ্বান করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিন যা তিনি তাঁর নবীদের দান করে থাকেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে বিভিন্ন শ্রেণি-গোত্রের মুসলমান সকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ও তোমাদের কাছে আমার প্রাপ্য অধিকারের কসম দিয়ে বলছি যে, যদি আমার পক্ষ থেকে কারও প্রতি কোন অত্যাচার বা অবিচার হয়ে থাকে তাহলে সে উঠে আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক, কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে একই কথা বলেন কিন্তু কেউ উঠে দাড়ালো না। তিনি (সা.) তৃতীয়বার বলেন,! হে বিভিন্ন শ্রেণি-গোত্রের মুসলমানগণ, আল্লাহ্‌র ও তোমাদের কাছে আমার প্রাপ্য অধিকারের কসম দিয়ে বলছি যে, যদি আমার পক্ষ থেকে কারও প্রতি

কোন অবিচার হয়ে থাকে তাহলে কিয়ামত দিবসের প্রতিশোধের পূর্বেই আমার কাছ থেকে সে উঠে প্রতিশোধ নিক। তখন লোকদের মাঝ থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়াল, যার নাম ছিল উকাশা। তিনি মুসলমানদের ভিড় ঠেলে সামনে এলেন। এক পর্যায়ে রসূলে করীম (সা.)-এর মুখোমুখি দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি বারবার কসম খেয়ে না বললে আমি কখনো উঠে দাঁড়াতাম না।

হযরত উকাশা বলতে লাগলেন, এক যুদ্ধে আমি আপনার সাথে ছিলাম, সেখান থেকে ফেরার পথে আমার উটনী আপনার উটনীর নিকটে চলে আসে তখন আমি আমার বাহন থেকে নেমে আপনার নিকটে আসি যেন আপনার পায়ে চুমু খেতে পারি কিন্তু আপনি আপনার হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন যা আমার পার্শ্বদেশে লাগে, আমি জানি না যে, সেই লাঠি আপনি উটনীর গায়ে মেরেছিলেন নাকি আমাকে? তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপের কসম, খোদার রসূল ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই তোমাকে মারতে পারেন না। এরপর তিনি (সা.) হযরত বেলালকে সম্বোধন করে বলেন, হে বেলাল! ফাতেমার ঘরে যাও আর তার কাছ থেকে সেই লাঠিটি নিয়ে আস। হযরত বেলাল যান এবং গিয়ে হযরত ফাতেমাকে বলেন, হে রসূল কন্যা! আমাকে সেই ছড়িটি দিন। তখন ফাতেমা বলেন, হে বেলাল! আমার পিতা এই লাঠি দিয়ে কি করবেন? এটি কি হজ্জের মাস নয়? যুদ্ধের মাস তো নয়। তখন হযরত বেলাল বলেন, হে ফাতেমা! আপনার পিতা রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে আপনি কতই না অনবহিত-অনবগত! রসূলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আর মানুষকে প্রতিশোধ নিতে বলছেন। তখন হযরত ফাতেমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে বেলাল! রসূলে করীম (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া কে পছন্দ করবে? এরপর তিনি বলেন, হে বেলাল! হাসান এবং হোসেনকে সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে যেতে বল আর তাকে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বল। তারা যেন সেই ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে প্রতিশোধ নিতে না দেয়। এরপর হযরত বেলাল মসজিদে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে সেই লাঠি দেন আর তিনি (সা.) সেই লাঠি উকাশার হাতে তুলে দেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) উভয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলেন, হে উকাশা! আমরা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কিছু করো না। তখন রসূলে করীম (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আবু বকর এবং উমর! তোমরা থাম, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উভয়ের মর্যাদা জানেন। এরপর হযরত আলী (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন, হে উকাশা! আমি আমার সারা জীবন মহানবী (সা.)-এর সাথে কাটিয়েছি আর রসূলে করীম (সা.)-কে তুমি আঘাত করবে– এটি দেখা আমার জন্য অসহনীয়। অতএব এই নাও আমার শরীর, আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ নাও এবং নির্দ্বিধায় আমাকে শতবার আঘাত কর কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিও না।

তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, হে আলী! বসে যাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমার নিয়্যত এবং মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত আছেন। এরপর হযরত হাসান এবং হোসেন দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে উকাশা! আমরা রসূলে করীম (সা.)-এর দৌহিত্র আর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মতই। তিনি (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আমার স্নেহভাজনরা! বসে যাও। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে উকাশা! আঘাত কর। হযরত উকাশা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যখন আমাকে আঘাত করেছিলেন তখন আমার পেটের ওপর কাপড় ছিল না, তখন তিনি (সা.) নিজের পেটের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নেন, এতে মুসলমানরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলে, উকাশা কি সত্যি সত্যিই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আঘাত করবে? কিন্তু হযরত উকাশা যখন মহানবী (সা.)-এর দেহের শুভ্রতা দেখেন তখন পাগলপারা হয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং তাঁর (সা.) দেহে চুমু খেতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কার হৃদয় আপনার থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইবে? তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করবে? তখন হযরত উকাশা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এই আশায় ক্ষমা করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন। তখন তিনি (সা.) মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সঙ্গী দেখতে চায় সে যেন এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে। অতএব মুসলমানরা উঠে দাঁড়িয়ে হযরত উকাশার মাথায় চুমু দিতে থাকে এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে যে, তুমি অনেক উন্নত মর্যাদা লাভ করেছ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর সঙ্গ লাভ করেছ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, অষ্টম খণ্ড, পৃ.৪২৯ থেকে ৪৩১, কিতাব-আলামাতিন নাবুয়্যাত, হাদীস নং ১৪২৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে প্রকাশিত, সন ২০০১) অতএব, এই ছিলেন হযরত উকাশা। তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগান, কী জানি আবার কখনো এ সুযোগ পাওয়া যায় কিনা, রসূলে করীম (সা.) যে নিজ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিচ্ছেন তাই তিনি ভাবলেন, এটিই সুযোগ, জীবিত থাকতেই তাঁর (সা.) শরীরে শুধুমাত্র চুমুই খাব না বরং আদরও করব।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে হযরত উকাশা মুরতাদদের দমনের জন্য রওয়ানা হন, ঈসা বিন উমায়লা তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ মানুষের মুকাবিলায় রওয়ানা হওয়ার সময় আযানের ধ্বনি শুনলে আক্রমণ করতেন না আর আযান না শুনলে আক্রমন হানতেন। তিনি (রা.) যখন বাযাহা নামক স্থানে বসবাসকারী জাতির কাছে পৌঁছেন, তখন হযরত উকাশা বিন মিহসান এবং হযরত সাবেত বিন আক্রামকে শত্রুদের সংবাদ নিয়ে আসার জন্য গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। হযরত উকাশার ঘোড়ার নাম ছিল আর্‌রাযাম আর হযরত সাবেতের ঘোড়ার নাম আল মুহাব্বার। এই উভয়ের মোকাবিলা হয় তুলায়হা এবং তার ভাই সালামার সাথে যারা মুসলমানদের সম্পর্কে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের জন্য নিজ বাহিনীর পূর্বেই এসে গিয়েছিল। তুলায়হার মোকাবিলা হয় হযরত উকাশার সাথে আর সালামার মোকাবিলা হয় হযরত সাবেতের

সাথে আর এই উভয় ভাই-ই সেই দুইজন সাহাবীকে শহীদ করে। আবু ওয়াকেদ আল-লাইসি বর্ণনা করেন, আমরা দু'শ অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মুখভাগে অবস্থান করছিলাম। আমরা শাহাদত বরণকারী হযরত সাবেত ও হযরত উকাশার মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে যাই। এক পর্যায়ে হযরত খালেদ আসেন এবং তার নির্দেশে আমরা হযরত সাবেত এবং হযরত উকাশাকে তাদের রক্তরঞ্জিত কাপড়েই দাফন করি। এই ঘটনা বারো হিজরী সনের, এভাবে তাদের শাহাদাত হয়। (আত্‌তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৪৫, সাবেত বিন আকরাম, দারুল এহয়িয়াতুত তারাসুল আরাবী, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)

হযরত খারেজা বিন যায়েদ মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হযরত খারেজা বিন জায়েদের সম্পর্ক ছিল খাজরাজ গোত্রের 'আগার' শাখার সাথে। হযরত খারেজার কন্যা হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন, যার গর্ভে হযরত উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত খারেজা বিন জায়েদ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি গোত্রের নেতা ছিলেন আর তাঁকে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হতো। তিনি আকাবায় বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। (আত তিবকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭১, ওয়া মিন বানি আলহারেস... খারেজা বিন যায়েদ, দারুল এহয়াউত্‌তারাসুল আরাবী, ১৯৯৬ সালে বৈরুত থেকে প্রাকাশিত) হিজরত করে মদীনায় আসার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদের ঘরে অবস্থান করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেন আর ওহুদের যুদ্ধে অনেক সাহসিকতা এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তিনি বর্শাবিদ্ধ হন এবং তার গায়ে তেরো বা ততোধিক আঘাত আসে। তিনি আহত অবস্থায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় তার পাশ ঘেঁসে সাফওয়ান বিন উমাইয়া যায়। সেঁতাকে দেখে চিনতে পারে এবং তার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে আর তার লাশও বিকৃত করে আর বলে এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে আবু আলী অর্থাৎ আমার পিতা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করেছিল। আজ আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সেসব সাহাবীদের মধ্য থেকে উত্তম লোকদের হত্যা করার এবং নিজের হৃদয় প্রশান্ত করার সুযোগ পেয়েছি। সে হযরত ইবনে কাউকাল, হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত অউস বিন আরকামকেও হত্যা করে। হযরত খারেজা এবং হযরত সাদ বিন রাবিকে একই কবরে দাফন করা হয়। তারা তার চাচাত ভাই ছিলেন, [(আল ইসতি'আব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩-৪, খারেজাহ বিন যায়েদ (রা.), দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)] এর বিবরণ হলো, ওহুদের দিনে হযরত আব্বাস বিন উবাদা উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ এবং নিজেদের নবীর সাথে সংযুক্ত থাক, তোমরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা তোমাদের নবীর কথা অমান্য করার কারণে। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ কর নি। এরপর হযরত আব্বাস বিন উবাদা নিজের শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম খুলে ফেলেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কী এর প্রয়োজন আছে? হযরত খারেজা বলেন, না, তুমি যে জিনিসের আকাঙ্খা কর সেই একই জিনিস আমিও চাই। এরপর তারা সবাই শত্রুর সাথে লড়াই আরম্ভ করেন। আব্বাস বিন উবাদা বলেন, আমাদের চোখের সামনে যদি মহানবী (সা.) কোন আঘাত পান বা কোন কষ্ট পান তাহলে আমরা নিজেদের প্রভুর কাছে কী জবাব দিব? আর হযরত খারেজা বলতেন, আমাদের প্রভুর কাছে আমাদের কোন অজুহাতও চলবেনা না আর কোন যুক্তিপ্রমাণও কাজে দেবে না। হযরত আব্বাস বিন উবাদাকে সুফিয়ান বিন আব্দিস শামস সালেমি শহীদ করে এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদের দেহে দশটির অধিক তীরের আঘাত আসে। (কিতাবুল মাগাযী, প্রথম খণ্ড ২২৭-২২৮, বাব: গাযওয়ায়ে ওহদ, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ বৈরুত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)

ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দোখশাম হযরত খারেজা বিন যায়েদের পাশ ঘেঁসে যান। হযরত খারেজা চরম আহতাবস্থায় বসে ছিলেন। তিনি তেরোটির মত মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালেক তাকে বলেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কে শহীদ করা হয়েছে– আপনি কি জানেন না? হযরত খারেজা বলেন, তাঁকে শহীদ করা হলেও আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতভাবে জীবিত আছেন আর তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তোমরাও তোমাদের ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ কর। (কিতাবুল মাগাযী, প্রথম খণ্ড পৃ.২৪৩ বাব: গাযওয়ায়ে ওহদ, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ বৈরুত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)

হযরত খারেজার সন্তান ছিল দু'জন। তাদের একজন ছিলেন হযরত যায়েদ বিন খারেজা যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খারেজা বিন যায়েদ-এর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা, যার বিবাহ হয় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যখন মৃত্যু হয় তখন তার স্ত্রী হযরত হাবীবা গর্ভবতী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, তার গর্ভে আমাদের কন্যা সন্তান হবে বলে আমি আশা করি। সত্যিই তার ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। (উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪০-৬৪১, খারেজাহ বিন যায়েদ, দারুল ফিক্‌র বৈরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ। তাঁর মাতার নাম ছিল আম্‌রা বিনতে ওবাইদ বিন মততুরুফ। হযরত যিয়াদের এক পুত্র ছিল আব্দুল্লাহ্। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় সত্তরজন সাহাবীর সাথে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর মদীনায় ফিরে আসতেই তিনি নিজের মূর্তিপূজারী গোত্র বনু বেয়াযার মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন, এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনিও তাঁর (সা.) সাথে হিজরত করেন এবং তাঁর পরে সেখানে পৌঁছেন। তাই হযরত যিয়াদকে মুহাজের আনসারী বলা হয়। তিনি ছিলেন

একাধারে মুহাজিরও আবার আনসারও। বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে হযরত যিয়াদ মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। (আত্‌তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.৩০২, সাবেত বিন আকরাম, দারুল এহয়িয়াতুত তারাসুল আরাবী, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত) মহানবী (সা.) হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছেন এবং বনু বেয়াযা গোত্রের মহল্লার পাশ দিয়ে যান তখন হযরত যিয়াদ তাঁকে (সা.) সুস্বাগত জানান এবং তার ঘরে অবস্থানের প্রস্তাব দেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে মুক্তাবস্থায় ছেড়ে দাও, সে নিজেই নিজের গন্তব্য খুঁজে নিবে।

নবম হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সা.) সদকা এবং যাকাত সংগ্রহ করার জন্য পৃথক পৃথক সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। তখন হযরত যিয়াদকে 'হাযরে মওত' এলাকার যাকাত সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। হযরত উমরের যুগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি কুফায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানেই ৪১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। (সারওয়ারে কায়েনাত কে পাচাস সাহাবা, রচয়িতা তালেবুল হাশেমী, পৃ. ৫৫৭-৫৫৯, মেট্রো প্রিন্টার্স লাহোর থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত)

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন ধর্ম-ত্যাগের নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় আর মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন আশআস বিন কায়েসুল কান্দিও ধর্ম ত্যাগ করে। তাকে দমনের জন্য হযরত যিয়াদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি যখন তার ওপর হামলা করেন তখন সে নাহীর দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত যিয়াদ কঠোরভাবে দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এক পর্যায়ে নিরুপায় হয়ে সে এই বার্তা প্রেরণ করে যে, আমাকে এবং আরও নয় ব্যক্তিকে যদি নিরাপত্তা দেয়া হয় তাহলে আমি দুর্গের দরজা খুলে দিব। হযরত যিয়াদ বলেন, চুক্তিপত্র লিখে নিয়ে আস, আমি তার ওপর সত্যায়ন ও স্বাক্ষর করে দিব। এরপর সে দরজা খুলে দেয়। পরে যখন সেই চুক্তিপত্র দেখা হয় তখন দেখা যায়, অন্য নয় ব্যক্তির নাম তো লেখা আছে কিন্তু সে নিজের নামই লিখতে ভুলে গেছে। অতএব তাকে অন্যান্য বন্দির সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। (ইমতিআউল আসমা', চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত মুআত্‌তেব বিন উবায়েদ। তার কোন সন্তান ছিল না। তার ভাতিজা উসায়ের বিন উরুয়া তার ওয়ারিশ হন। হযরত মুআত্‌তেব বিন উবায়েদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ নেন এবং রজী'র ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। (আত তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৪০, ওয়া মিন হুলাফাঈ বানী যাফর, দারুল এহইয়ায়িত তারাসুল আরাবী, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত) রজীর ঘঁটনায় যাতে দশজন মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছিল তা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, সে দিনগুলো মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর কাছে ভীতিপ্রদ সংবাদ আসছিল। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত ছিলেন মক্কার কুরাইশদের বিষয়ে, যারা ওহদ যুদ্ধের কারণে অনেক দুঃসাহসী ও উদ্ধ্যত হয়ে উঠেছিল। এই ঝুঁকির বিষয়টি আঁচ করতে পেরে মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে তাঁর দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং তাদের আমীর নিযুক্ত করেন আহসান বিন সাবেতকে আর তাদেরকে চুপি চুপি মক্কার কাছে গিয়ে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার এবং তাদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে (সা.) সংবাদ প্রেরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এই দল রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই 'আযল' ও 'কারা' গোত্রের কয়েকজন লোক তাঁর (সা.) কাছে আসে এবং বলে, আমাদের গোত্রে অনেক লোক ইসলামের প্রতি আকর্ষণ রাখে। আপনি কিছু লোক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে মুসলমান বানাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে। মহানবী (সা.) তাদের এই ইচ্ছার কথা জানার পর সেই দলটিকেই তাদের সাথে প্রেরণ করেন যেটিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি পরবর্তীতে জানা গেছে যে, এরা মিথ্যাবাদী ছিল আর বনু লেহইয়ানের উসকানিতে মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত অজুহাতে মুসলমানরা মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা। বনু লেহইয়ান এই কাজের বিনিময়ে আযল এবং কারার লোকদের জন্য বহু উট পুরস্কারস্বরূপ নির্ধারণ করে রেখেছিল। আযল এবং কারার এই বিশ্বাসঘাতক লোকেরা যখন আসফান এবং মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে তখন তারা গোপনে বনু লেহইয়ান গোত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা চলে আস। তখন বনু লেহইয়ানের দুইশত যুবক, যাদের মাঝে একশ ছিল তীরন্দাজ, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয় আর রজী' নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলে। দশজন মানুষ দুইশত সৈন্যের কীইবা মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু মুসলমানদেরকে অস্ত্রসমর্পনের শিক্ষা দেয়া হয় নি।

যদি এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তোমাদেরকে যদি পরিবেষ্টন করে ফেলা হয় তখন নির্দেশ হল যুদ্ধ কর। অতএব সেই সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে কাছের একটি টিলায় উঠে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কাফেররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা আদৌ দোষনীয় বিষয় ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে, তোমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে আস আমরা শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে আমরা হত্যা করব না। আসেম (রা.) তখন উত্তর দেন,তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি ও শপথে আমাদের কোন বিশ্বাস নেই, আমরা তোমাদের এই দায়িত্ব নেয়ার অঙ্গীকারে নিচে নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি আকাশের দিকে মুখ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, তুমি তোমার রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও। মোটকথা, আসেম এবং তার সঙ্গীরা তাদের মোকাবিলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যখন সাতজন সাহাবী শহীদ হন এবং শুধুমাত্র খোবাইব বিন আদি ও যায়েদ বিন দাসেনা এবং আরো একজন সাহাবী বাকি রয়ে যান, তখন কাফেররা যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের জীবিত পাকড়াও করা, পুনরায় তাদেরকে ডেকে বলে, এখনও নিচে নেমে আস, আমরা শপথ করে বলছি, তোমাদের কোন ক্ষতি

করব না। এবার এই সরলপ্রাণ মুসলমানরা তাদের ফাঁদে পাঁ দিয়ে নিচে নেমে আসেন। কিন্তু নিচে আসা মাত্রই কাফেররা তাদের তীরধনুকের রশি দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। এতে খোবায়েব এবং যায়েদের সঙ্গী, যার নাম ইতিহাসে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক উল্লেখ হয়েছে, তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটি তোমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, আর জানা নেই যে, সামনে গিয়ে তোমরা আরো কী কী করবে। অতএব আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। তখন কাফেররা আব্দুল্লাহ্‌কে কিছু দূর পর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে জোরপূর্বক নিয়ে যায় আর এরপর তাকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে রাখে। যেহেতু তাদের প্রতিশোধস্পৃহা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাই কুরাইশকে খুশি করার জন্য এবং সেই সাথে অর্থের লোভে খোবাইব ও যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌঁছে তাদেরকে কুরাইশের কাছে বিক্রি করে দেয়। খোবাইবকে হারেছ বিন আমর বিন নওফেলের ছেলে ক্রয় করে নেয়। কেননা বদরের যুদ্ধে খোবাইব হারেছকে হত্যা করেছিলেন আর যায়েদকে ক্রয় করে সাফওয়ান বিন উমাইয়া। অবশেষে তাদেরকেও হত্য করা হয়। (সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, রচয়িতা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এম.এ., পৃ. ৫১৩-৫১৪)

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আরেকজন হলেন, হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)। হযরত খালেদ বিন বুকায়ের, আকেল, হযরত আমের এবং হযরত আইয়্যাস একত্রে দারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এই চার ভাই দারে আরকামে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত খালেদ বিন বুকায়ের এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনা-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং রজী'র ঘটনায় শহীদ হন, যে ঘটনার কথা একটু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে দশজন সাহাবীকে প্রতারিত করে শহীদ করা হয়েছিল। [আত তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, আকেল বিন আবিল কাবির (রা.), খালিদ বিন আবিল কাবির (রা.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত] বদরের যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌হাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুরাইশের কাফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এতে হযরত খালেদ বিন বুকায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে চৌত্রিশ বছর বয়সে রজী'র যুদ্ধে আসেম বিন সাবেত এবং মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানবি–এর সাথে আযল ও কারা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। [উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ.৬৪৭, খালিদ বিন বাকায়ের (রা.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত]

ইবনে ইসহাক এ সম্পর্কে বলেন, যখন আযল এবং কারা গোত্রের লোকেরা এই সাহাবীদের নিয়ে রজী নামক স্থানে পৌঁছে, যা ছিল উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম অর্থাৎ 'রজী' একটি জায়গা যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণারনাম এবং হেজাযের পাশে অবস্থিত ছিল; তারা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থাৎ যেসব লোক তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল,তারা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ধোঁকা দেয় আর হুযায়েল গোত্রকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। সাহাবীরা তখনো তাদের তাবুতেই ছিলেন যখন তারা দেখেন যে, চতুর্দিক থেকে মানুষ তরবারি হাতে নিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তখন তারাও বীরত্বের সাক্ষর রেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সেই লোকেরা (অর্থাৎ কাফেররা) বলে যে, খোদার কসম, আমরা তোমাদের হত্যা করব না। বরং আমরা তোমাদেরকে শুধু পাকড়াও করে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাব এবং তাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রতিদানে কিছু নিয়ে নিব; আমাদের চাওয়া কেবল এতটুকু। হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.), হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) এবং হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা মুশরেকদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি না। অবশেষে এই তিনজনই যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন । (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ.৫৯১-৫৯২, যিকরে ইয়ামির রাবি' ফি সুন্নাতি সালাস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)

হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.) তাদের সম্পর্কে স্বরচিত এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

'আলা লায়তানি ফিহা শাহেদতু
ইবনাতারেক
ওয়া যায়দান ওয়ামা তুগনিল আমানী ওয়া
মুরসাদা
কাদ দাফা'তু আন হিব্বী খুবায়ব ওয়া
আসেম
ওয়া কানা সিফাউন লাউ তাদারাকতু
খালেদা'

[উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪৭, খালিদ বিন বুকায়ের (রা.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত]

অর্থাৎ হায়! আমি যদি এতে (অর্থাৎ রজী'র ঘটনায়) ইবনে তারেক এবং যায়েদ এবং মুরসাদের সাথে থাকতাম! যদিও বাসনা অনেক সময় কোন কাজে আসে না কিন্তু আমি আমার বন্ধু খুবায়েব এবং আসেমকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম।আর যদি আমি খালেদকে পেয়ে যেতাম তাহলে সেও হয়ত বেঁচে যেতো।

অতএব, এরা সেই সকল পুণ্যাত্মা, যারা ধর্মের সুরক্ষার খাতিরে এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের এক রচনায় লিখেছেন যে, সেই অনুগ্রহশীল খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি অনুগ্রহকারী এবং দুঃখ মোচনকারী। তাঁর রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম, যিনি সকল শ্রেনীর মানুষের ইমাম পবিত্রচিত্ত আর বেহেশতের প্রতি আকর্ষণকারী। তাঁর সাহাবীদের প্রতি সালাম, যারা ঈমানের ঝর্ণাধারার প্রতি তৃষিতের ন্যায় ছুটে গেছেন এবং অজ্ঞতার অন্ধকার রাতে জ্ঞান ও কর্মের ঔৎকর্ষে আলোকিত হয়েছেন। (নুরুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, রুহানী খাযায়েন, অষ্টম খণ্ড, পৃ.১৮৮)

অপর একস্থানে সাহাবীদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন যে, তারা দিনের বেলা (যুদ্ধ) ময়দানের সিংহ এবং রাতের সন্ন্যাসী ও

ধর্মের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন (রাতের রাহেব হওয়ার অর্থ হলো, তারা রাতে ইবাদতকারী আর ধর্মের তারকা)। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। (নাজমুল হুদা, রুহানী খাযায়েন, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ১৭) আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও নিজেদের জ্ঞান এবং কর্মের মানকে উন্নত করার এবং রাতের ইবাদতের মান উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, যাউগান্ডার মুবাল্লেগ মুকার্‌রম ইসমাঈল মালাগালা সাহেবের। তিনি গত ২৫ মে ২০১৮ তারিখে জুমুআর নামাযের পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে নিজ প্রভুর (ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর) সাথে মিলিত হন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ইসমাঈল মালাগালা সাহেব ১৯৫৪ সনে উগান্ডার মাকুনু জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামাতা উভয়ে খ্রিষ্টান ছিলেন, অতএব তিনি জন্মগতভাবে খ্রিষ্টান ছিলেন। মালাগালা সাহেব আহমদী এক বন্ধু হাজী শোয়েব নাসীর সাহেবের সম্পর্কে ভাই ছিলেন, তাই তার ঘরে তার যাতায়াত ছিল। হাজী শোয়েব সাহেবের মাধ্যমেই ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তার কাছে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়, আর অবশেষে ১৯৭৮ সনে তিনি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হাজী শোয়েব নাসির সাহেবের কাছে বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই খ্রিষ্টান পাদ্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম। এখন যেহেতু আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাই আমি কি ইসলামের কোন সেবা করতে পারি? তখন তাকে বলা হয়, আপনি ইসলামের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তখন উগাণ্ডা জামাতের বর্তমান আমীর মোহাম্মদ আলী কায়রে সাহেব, পাকিস্তান থেকে জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা সমাপ্ত করে উগান্ডা পৌঁছেছিলেন। অতএব তিনি ১৯৮০ সনে মালাগালা সাহেবকে আরও পাঁচজন খোদ্দামের সাথে পাকিস্তান প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর মাসে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ফাসলুল খাসে ভর্তি হন আর ১৯৮৮ সনের ১লা মার্চে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা জীবনের প্রেক্ষিতে জামেয়ার তদানিন্তন প্রিন্সিপাল সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব নিজের মন্তব্যে তার সম্পর্কে লিখেন, তিনি পড়ালেখার দিক থেকে কিছুটা দুর্বল কিন্তু অনুগত্য ও সহযোগিতার চেতনায় সমৃদ্ধ ছাত্র ছিলেন আর ছিলেন নম্র ও ইবাদতগুজার। বুযুর্গদের সাথে দেখা করা এবং তাদেরকে দোয়ার জন্য বলাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৯৮৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে পাকিস্তান থেকে হিজরত করতে হয়, তখন এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সাহসিকতার সাথে যারা পাহারার দায়িত্ব পালন করতো তিনি তাদের একজন ছিলেন। বর্তমান প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়্যায সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, আমরা জামেয়ায় সমসাময়িক যুগে পড়াশোনা করেছি। খুবই পুণ্যবান প্রকৃতির স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি জামেয়ার সেসব ছাত্রের মাঝে গণ্য হতেন যাদের মাঝে ইবাদত এবং সাধনার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুগত্য তার বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, নকীব এবং যয়ীম হওয়ার কারণে তার সাথে বেশ কয়েকবার আমার কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাকে অনেক বিনয়ী, আদেশ মান্যকারী ও অনুগত পেয়েছি। ফুটবল খেলার বেশ আগ্রহ রাখতেন। দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় গণ্য হতেন আর দলে তাকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

জামেয়ার পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৮৮ সনে উগান্ডায় মুবাল্লেগ হিসেবে যথারীতি তার পদায়ন হয় আর সেখানে তিনি বিভিন্ন জামা'তে মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেন। ২০০৭ সনে উগান্ডার আরো দুই জন মুবাল্লেগের সাথে তিনি পাকিস্তানে যান, সেখানে তিনি উগান্ডার ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদের পুণঃ যাচাই করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর তিন মাসের ভেতর তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেন। জামেয়াতে অধ্যয়নকালে জ্ঞান বা মেধাগত দিক থেকে বাহ্যত কিছুটা দুর্বল হলেও পরবর্তীতে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগামী হন। নিজেকে জ্ঞানে অনেক সমৃদ্ধ করেছিলেন। তার মাঝে তবলীগের অনেক আগ্রহ ছিল এবং তার তবলীগে অনেকই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। সাইকেলে করেই অনেক দীর্ঘ তবলীগি সফর করতেন। একবার তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হন কিন্তু তার অবর্তমানে তার স্ত্রীর মৃত্যু সংঘটিত হয় কিন্তু যোগাযোগের কোন উপায় ছিল না। তিনি তবলীগি সফর থেকে ফিরে এসে জানতে পারেন যে, স্ত্রী মারা গেছেন এবং তার দাফন-কাফনও হয়ে গেছে। অত্যন্ত বিনম্রভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থেকে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহানুভূতিশীল এবং মহানুভব মানুষ ছিলেন। গরীব এবং মিসকীনদের অনেক খেয়াল রাখতেন। খেলাফতের জন্য ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। খলীফার সকল নির্দেশ পালন করাকে আবশ্যক মনে করতেন। আফ্রিকান মুবাল্লেগ, বিশেষ করে ওয়াকফে জিন্দেগীদের মাঝে আমি দেখেছি যেখেলাফতের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, মোটের ওপর প্রায় সকল আফ্রিকানদেরই চিত্র এটি।

উগান্ডার আমীর মোহাম্মদ আলী কায়রে সাহেব লিখেন, মরহুম একজন আদর্শ স্থানীয় মুরব্বী, অত্যন্ত নেক হৃদয়ের অধিকারী, তবলীগে অনুরক্তএবং ধর্মের কাজে নিবেদিত মানুষ ছিলেন। অনেক সমস্যা সত্ত্বেও কখনও অভিযোগ করেন নি, বরং সার্বিকভাবে ধর্মের সেবায় রত ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন আর এর স্বল্পকাল পরই তৃতীয় বিয়ে করেন। তার এক স্ত্রী লিখেন, আমি তাকে সারা জীবন অনেক স্নেহশীল, নম্রহৃদয় এবং সকল অবস্থায় শান্ত ও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ দেখেছি। তার কন্যা লিখেন, আমাদের পিতা অনেক মহানুভব এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সর্বদা আমাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিতেন। মরহুম দুই স্ত্রী এবং নয় জন সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি করুনা করুন, তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার বংশধরদেরকেও সর্বদা আহমদীয়াত এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৪০তম কিস্তি)

ব্যক্তিগত শান্তি

১. নিজের সাথে শান্তিতে থাকা, ২. সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা, ৩. আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভালবাসা, ৪. অপরের সেবা করা, ৫. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা, ৬. অন্যান্য মানুষের জন্য সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা, ৭. সদয় ও স্নেহময় সেবাযত্নের পরিধি বৃদ্ধি করা, ৮. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ৯. আল্লাহ্ ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়।

"যারা ঈমান আনে, এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" (আর্ রাদ, ১৩:২৯)।

নিজের সাথে শান্তিতে থাকা

পরিশেষে শেষ– তবে অপ্রয়োজনীয় নয়, -আমি দিয়ে বলতে চাই যে, একটি শান্তিপূর্ণ অথবা অশান্তিপূর্ণ সমাজের সৃষ্টিতে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের গুণাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাপেক্ষা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমরা এ পর্যন্ত ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সেই সৌধসমূহের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি যা ইসলাম নির্মাণ করতে চায়। এই সব সৌধ নির্মাণের জন্য যে ইট ব্যবহার করতে হবে তার ওপরে অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্র ও গুণাগুণের ওপরেই বেশী জোর দিয়েছে ইসলাম। বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা বিস্তারিতভবে বলা আছে কুরআন করীমের সর্বত্রই। আমার বুঝ মতে, ইসলাম সমাজের প্রতিটি সদস্যের চরিত্রে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্টগুলো সৃষ্টি করতে চায়।

সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা

ইসলামের মতে কামনা-বাসনা এবং ইচ্ছা-অভিলাষ উভয়ই কর্মরত ও হ্রাসকৃত হয়ে থাকে ঐশী হেদায়াত বা নির্দেশনার অধীনে, যাতে করে একটা সুষম ভারসাম্য অর্জিত হতে পারে। এইরূপ একটা ভারসাম্য ব্যতীত সামাজিক শান্তি অর্জন করা অসম্ভব। ইসলাম সেই সমস্ত বাসনা-কামনা এবং ইচ্ছা-অভিলাষকে উদ্বুদ্ধ করে যেগুলো পূরণের জন্য মানুষের আর্থিক অবস্থার ওপরে ততটা নির্ভর করতে হয় না, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সমাজের সব স্তরের মানুষই বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পেতে পারে।

সাধারণ গতানুগতিক অবস্থার উর্ধ্বে উঠার এবং মান-মর্যাদা অর্জনের অভিলাষ খুবই স্বভাবিক। কিন্তু, অন্যদেরকে ডিঙ্গিয়ে ওপরে ওঠার এবং বাসনাকে যদি সুশৃংখল ও হ্রাস করা না হয়, তাহলে ক্ষতিকর হতে বাধ্য। ঈর্ষা এবং অবৈধ ক্রিয়াকলাপ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মুক্ত প্রতিযোগিতার চেতনাকে এতটা বিষয়ে তুলতে পারে যে, সারাটা সমাজই তখন প্রতিযোগিতার চেতনা থেকে লাভবান হওয়ার চাইতে বরং দুর্ভোগ পোহাতেই শুরু করে।

খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভের জন্য ড্রাগ ব্যবহারের প্রবণতাকে এক্ষেত্রে একটা ছোট উদাহরণরূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্প, ব্যবসায় ও জাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য সমতল মাঠের অভাব অত্যন্ত বিশ্রী উদাহরণ পেশ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অবৈধ খেলার ধরণ, এক্ষেত্রে, উন্নত দেশগুলোর ধরণ থেকে ভিন্ন। তৃতীয় বিশ্বে দ্রুত অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য যে সমস্ত পন্থা অবাধে অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে, দুর্নীতি, ভেজাল-মিশ্রণ, চুক্তিভঙ্গ, প্রতারণা ইত্যাদি। এ কারণেই মানবীয় কার্যকলাপের সকল ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। এই জাতীয় শিক্ষার অভাব অতি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

ইসলাম আমাদেরকে এ ব্যাপারে যে বিস্তারিত নির্দেশাবলী দান করে, তা প্রতিযোগিতামূলক আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু, হায়! স্বয়ং মুসলিম দেশগুলোতেও, যেখানে ইসলামীকরণ এবং মৌলবাদের এত কথা শোনা যায়, সেখানেও শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য বিষয়গুলোকে ইসলামী করণের জন্য কদাচিৎ কাউকে কোন সত্যিকারের

উদ্যোগ নিতে দেখা যায়; কী করুণ এই ট্রাজেডি!

এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার সারকথা ব্যক্ত করা হয়েছে কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে: "এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন (চূড়ান্ত) লক্ষ্যস্থল রয়েছে যার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং, (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর; তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান।" (আল্ বাকারা, ২:১৪৯)

এই সংক্ষিপ্ত বয়ানে, সীমাহীন প্রজ্ঞা বিস্ময়কররূপে সন্নিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়েছে। এই বাণী পথ-নির্দেশক নীতি হিসেবে, সর্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষেত্রেই গৃহীত হতে পারে। সাধুতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। সাধুতাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। স্বয়ং এটাই হবে সমস্ত প্রতিযোগিতার বিষয়। সমস্ত অবৈধ কাজকর্ম বা তৎপরতাকে এবং সংকীর্ণতাকে এক আঁচড়েই সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে হবে।

সময় থাকলে, আমরা আরও ব্যাপক আলোচনায় যেতে পারতাম এবং ইসলামী শিক্ষা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম যে, এই শিক্ষা কী করে প্রতিযোগিতাকে সুস্থ, খাঁটি ও বিশুদ্ধ রাখে। মানুষ কদাচিৎ উপলব্ধি করে যে, হৃদয় ও মনের সত্যিকারের শান্তি নিহিত থাকে সৎ হওয়ার মধ্যে, অসৎ ও অবৈধ উপায়ে মিছেমিছে অসাধারণ হয়ে ওঠার মধ্যে নয়।

এই শ্রেণীর লোকেরা কখনই শান্তি পায় না– সমাজে, না নিজের অন্তরে। আপতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, তারা এক প্রকার বিরাট সাফল্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেহারা দেখাতে চায়; কিন্তু এটা তাদের শূন্যগর্ভ জয়ের ভড়ং মাত্র, এটা কোন প্রকৃত বিজয়ের আনন্দের প্রকাশ নয়।

পাকিস্তানের একজন কোটি পতির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে তার বন্ধুটির চরম হতাশার এক আশ্চর্যজনক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। একবার তিনি তাঁর বন্ধুর এক বিরাট সাফল্যে তাঁকে মুবারকবাদ জানান। কিন্তু, খুশী হওয়া তা দূরের কথা সেই কোটি পতি তৎক্ষণাৎ যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। তিনি তাঁর শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেললেন এবং দু'হাত দিয়ে এমনভাবে নিজের বুক খামছাতে শুরু করলেন, যেন জানোয়ারের মত থাবার নখ বসায়ে বুকটা ফাড়ায়ে ফেলবেন। এবং চীৎকার করে বলতে থাকলেন: 'জাহান্নামে যাক এই কামিয়াবী! কেউ যদি আমার বুকটা ফাড়িয়ে দেখতে পারতো, তাহলে সে দেখতো যে, এর ভেতরে শুধু আগুন জ্বলছে, আগুন'। এই যে কঠিন বাস্তবতা তা কেউ স্বীকার করে কেউ করে না। কিন্তু, কেউই মানবীয় স্বভাবকে পরাভূত করতে পারে না। কেউ বিশাল সম্পদ সঞ্চয়ে সাফল্য লাভ করতে পারে, এবং জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতায় ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু এই সত্য প্রকাশ করার মধ্যে কোন ঈর্ষা নেই যে, ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক, যদি থাকেও, এমন আছেন যে, যারা সত্যি সত্যিই সুখী এবং পরিতৃপ্ত। তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আছে কুরআন করীমে এইভাবে:

"দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য, যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং তা বারংবার গণনা করে। সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে, কক্ষণো না; সে নিশ্চয় 'হুতামায়' নিক্ষিপ্ত- হবে, এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে, 'হুতামা' কি? ইহা আল্লাহ্‌র লেলীহান আগুন, যা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়ে পৌঁছবে। নিশ্চয় ইহাকে চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর বন্ধ করে দেওয়া হবে, সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহে।" (আল্ হোমাযা-১০৪: ২-১০)

তাই সত্যিকারের নির্মল সন্তুষ্টি, যে কারো নাগালের বাইরেই থেকে যাবে, যদি না সে মানবস্বভাবে প্রোথিত বাসনা-কামনাকে সৎকাজে নিয়োজিত করে, সৎ হয়, এবং মহৎ জীবন যাপন করে।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভালবাসা

নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ পরিবার পদ্ধতিতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি করার কথা আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করে এসেছি। এখানে তার উল্লেখ করা হচ্ছে শুধু এই কথাটা তুলে ধরার জন্য যে, পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির গুণাবলী বিকশিত করার প্রয়োজন রয়েছে; কেননা এরাই প্রত্যেকে সমানভাবে এক একটি ইটরূপে সমাজসৌধ নির্মাণে ভূমিকা পালন করে থাকে। ইটের মান উন্নত করা ব্যতীত অট্টালিকার মান উন্নত করা সম্ভব নয়।

অপরের সেবা করা

অপরের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে নয়, অপরের সেবা করার মাধ্যমেই সন্তোষ অর্জন করার উপায় জোর দেয় ইসলাম। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে সেই বাণীই বর্ণিত রয়েছে: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ থেকে বারণ করে থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ"। (আলে ইমরান, ৩:১১১)

এতে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, মুসলমানদেরকে অন্যদের ওপরে খামাখাই শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়নি। মুসলিম হলেই যে সে অন্য সবার চাইতে এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে, তা ঠিক না। এই ভাল হওয়াটা প্রত্যেককে অর্জন করতে হবে, এবং তা অর্জন করতে হবে অন্যদের খেতমত করার মাধ্যমে, যাতে করে কল্যাণ বা নেয়ামতসমূহ তার কাছ থেকে প্রবাহিত হয়ে অন্য সবার ওপরে যায়।

হযরত রসূলে পাক (সা.) 'খাইর' যা শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে

একবার বলেছিলেন: 'ওপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম; ওপরের হাতগুলো দান করে এবং খরচ করে, নীচের হাতগুলো যাচ্না করে এবং গ্রহণ করে।' (ইব্নে উমর (রা.)-কর্তৃক বর্ণিত: বুখারী ও মুসলিম)।

পবিত্র কুরআনে এবং হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর অনেক সাহাবী (সঙ্গী) এ ক্ষেত্রে মানবিক গুণাবলীর অতি উচ্চ আদর্শের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁরা শুধু অন্যদের সেবা করার জন্য প্রচেষ্টাই চালাতেন না, বরং তাঁরা অন্যদের কাছে কোন প্রকার অনুগ্রহ চাইতে গ্রহণ করতেও ইতঃস্তত করতেন।

আউফ ইবনে মালিক আশজাই (রা.) থেকে বর্ণিত: **"সাত, আট বা নয় জন ছিলাম আমরা রসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর সঙ্গে, এক সময় তিনি বললেন, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে একটা অঙ্গীকার করবে না? আমরা কিছুক্ষণ আগেই একটা অঙ্গীকার করেছিলাম। সুতরাং আমরা বল্লাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা তো আপনার সঙ্গে আমাদের অঙ্গীকার করেছি।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবারও তাঁর প্রশ্নটি করলেন। আমরাও একই উত্তর দিলাম এবং বল্লাম, 'এখন আমরা আপনার সঙ্গে আর কি অঙ্গীকার করবো?' তিনি (সা.) বল্লেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায় করবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, এবং কারো কাছে কোন কিছু চাইবে না।' এরপর, আমি লক্ষ্য করেছি যে, যদি কখনও তাঁদের কারো হাত থেকে অশ্ব-চালানোর ছড়িও পড়ে যেতো, তিনি সেটাকেও তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে বলতেন না।"** (মুসলিম)

সেবার ওপরে এই কারণে জোর দেওয়া হয়নি যে, এটা একটা শুষ্ক এবং কঠোর পন্থা, বরং এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিশীলিত করা এবং মানুষের মধ্যে অনেক সমৃদ্ধ মূল্যবোধের অভিরুচি সৃষ্টি করা। একবার যদি অধিকতর উন্নত অভিরুচির সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে মানুষকে অপরের কৃপা ও সেবা পাওয়ার চাইতে অপরের সেবা করার মাধ্যেই বেশী আনন্দ লাভের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা ঈমানের অর্ধাংশ।

ইসলামী আদর্শের একটি বাণী এই যে, সৎকাজ স্বয়ং তার পুরস্কার। এটা যুক্তি দ্বারা বুঝানো যায় না; বুঝা যায় অভিজ্ঞতা দ্বারা।

(চলবে)

বিজ্ঞপ্তি

তালিম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালিম দপ্তর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ২০১৮ সালে সর্বশেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভাল ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের আগামী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯৫তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরীক্ষায় ভাল ফল অর্জনকারী ৮ম শ্রেণী এবং তদোর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। এ জন্য ইতিমধ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামাতের যে সকল শিক্ষার্থী সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য; স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ এর মধ্যে সে সকল শিক্ষার্থী তথ্য কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। তাই এ বিষয়ে আপনাদের সকলকে বিশেষ যত্নবান হওয়ার অনুরোধ করছি। আরও উল্লেখ থাকে যে কোন শিক্ষার্থী যদি আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম না পান; সেক্ষেত্রে সাদা কাগজে মূল শিক্ষা সনদের ফটোকপি সংযুক্ত করে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর আবেদন পাঠাতে পারবেন।

জামালউদ্দিন আহমদ
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম হাসপাতাল

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক নির্মিত সর্বপ্রথম যে হাসপাতাল, সেটির বিষয়ে আমরা পাঠকদেরকে অবহিত করতে চাই।

জামাত কর্তৃক নির্মিত সর্বপ্রথম হাসপাতালটি হচ্ছে 'নূর হাসপাতাল'। এ প্রকল্পটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর খেলাফতকালে, যখন মীর নাসির নওয়াব (রা.) [মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর শ্বশুর] জামাতের সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেন।

তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সেসব মানুষের জন্য একটি 'ওল্ড হোম' পরিচালনার, যারা দুর্বল ও জরাগ্রস্ত এবং বসবাসের জন্য যাদের কোন জায়গা ছিল না। এ সুযোগটি তৎকালে এমনই ছিল যে এজন্য কোন গৃহ বরাদ্ধ ছিল না আর কোন রোগীকে দেখা ও পরিচর্যার জন্য চিকিৎসা-সেবীরা বসারও কোন স্থান পেত না। চিকিৎসা দানের অস্থায়ী যে সুযোগটি চালু ছিল, তা স্থায়ীভাবে কাজে লাগাতে হযরত মীর সাহেব (রা.) একটি দালান বরাদ্দ করার চিন্তা করলেন আর মহৎ এ উদ্দেশ্যটি যাতে বাস্তবায়িত হয়, সেজন্য তহবিল সংগ্রহের একটি প্রকল্প চালু করতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে অনুরোধ জানালেন। হযরত মীর সাহেব (রা.)-এর এ অনুরোধের জবাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) কেবল এই স্কীমটি অনুমোদনই করলেন না, বরং এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু রুপি দান করলেন আর ২৬০ রুপি আরো দান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ প্রকল্পটি ছিল পুরুষ ও মহিলা- উভয় রোগীদের জন্যই স্বাস্থ্যসেবা দান করা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর অনুমোদনক্রমে হযরত মীর নাসির নওয়াব (রা.) বদর পত্রিকার ২৪ জানুয়ারী সংখ্যায় এমর্মে একটি ঘোষণা প্রকাশ করলেন যে, কাদিয়ানে স্বাস্থ্য-সরঞ্জামাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে জরুরী ভিত্তিতে ৪ ধরনের দালান আবশ্যক, যেজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) কেবল অনুমোদনই দান করেন নি, বরং ২৬০ রুপিও দান করেছেন। যে ৪টি

নূর হাসপাতাল: শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

দালান তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, সেগুলো হচ্ছে:

(১) বোর্ডিং এর নিকটে একটি মসজিদ [এটিই হচ্ছে সেই মসজিদ, যেটা পরবর্তীতে 'নূর মসজিদ নামে অভিহিত হয় এবং যেটিতে ১৯১৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়]।

(২) পুরুষদের জন্য একটি হাসাপাতাল [পরবর্তীতে যেটি 'নূর হাসাপাতাল' নামে অভিহিত হয়]।

(৩) উম্মুল মু'মেনিন ওয়ার্ড-নামে মহিলাদের একটি হাসপাতাল।

(৪) দার-উল-জুয়াদা নামে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্তদের আবাসনের জন্য একটি তত্ত্বধানালয়।

এই ৪টি দালান নির্মাণে সর্বমোট প্রায় ২০ হাজার কপি খরচের একটি আনুমানিক হিসাব দাঁড় করা হয়েছিল। বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এ তহবিল সংগ্রহে হযরত মীর নাসির নওয়াব (রা.) ভারত উপমাহাদেশের সর্বত্র সফর করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয় এবং তিনি যে তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন, তা দ্বারা সবগুলো সুযোগই পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলাদের জন্য যে হাসপাতাল (উম্মুল মু'মেনিন ওয়ার্ড), আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু নূর হাসাপাতালেই সেটি একীভূত করা হয়েছে, যেটিতে মহিলা ও পুরুষ– এ উভয়ের জন্যই চিকিৎসা-সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিটি ঘটনাই কখন সংঘটিত হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক একটি সময় নির্ধারণ করা থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর স্মৃতি রক্ষায় 'নূর হাসপাতাল'- নামে যে হাসপাতালটি রয়েছে, সেটি সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর সময় উদ্বোধন করা হয়। এ দালানটি কাদিয়ানের দারুল উলুম-এলাকায় স্থাপন করা হয়েছিল, পরবর্তীতে একই নামে (নূর হাসপাতাল) এটি 'দারুল ফবুহ্, কাদিয়ান' এর বর্তমান অবস্থানে স্থানন্তরিত হয়েছে।

হযরত মীর নাসির নওয়াব (রা.) যদিও ভারতে সর্বত্রই সফর করেছেন, তথাপি এসব সুবিধা অর্জনে তার সংগৃহীত তহবিলটি পর্যাপ্ত ছিল না। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯১৭-১৮ সনের বার্ষিক যে প্রতিবেদন, তা হাসপাতালটির চলমান কাজের বর্ণনা নিম্নরূপে উল্লেখ করে:

"দারুল উলুম'-এ অবস্থিত হাসপাতালটি সেই দান দ্বারাই নির্মিত হয়েছে, যা হযরত মীর নাসির নওয়াব (রা.) কর্তৃক সংগৃহীত হয়। কিন্তু আঞ্জুমানকেও তাতে অনুদান আর কিছু আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হয়, যদিও মূল হলঘরের ছাদটি তখনো স্থাপন বাকী ছিল। আমরা আশা করি যে, হিসাব বিভাগ তাদের আবেদনে এ প্রকল্পটি উল্লেখ করতে ভুলে যাবেন না।"

এই যে হাসপাতাল যেটি এতোটা কষ্ট সহ্য করে এবং এত স্বল্প সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, খোদার ফযলে বর্তমানে সেটি এমন এক হাসপাতালে পরিণত হয়েছে যে, তা কেবল কাদিয়ানেরই নয়, বরং পার্শ্ববর্তী শহর ও নগরগুলোর হাজার হাজার বাসিন্দার স্বাস্থ্য-সেবাও প্রদান করে চলছে। এর রয়েছে বড় বড় এমন সব বিভাগ, উন্নত একটি হাসপাতালে যা থাকা বাঞ্ছনীয়। এর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, এর মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল কর্মচারীদের পেশাগত যে যোগ্যতা, তা সরকারী অধিকাংশ হাসপাতাল এমনকি সমগ্র দেশের অধিকাংশ বেসরকারী হাসপাতালের যে মান, তদপেক্ষা অধিকতর ভাল। নূর হাসপাতাল বিগত ২০১৭ সালে এর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করেছে এবং তাতে সরকারের উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আহমদীয়া জামাত কর্তৃক প্রথম এ হাসপাতালটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ জামাতের আর্থিক সংকট প্রকটই ছিল। কিন্তু সেবার এ উদ্যোগ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানবজাতি, তথা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের স্বাস্থ্য-সেবাদানের ক্ষেত্রে এ জামাত সর্বদা কতটাই না উদ্বিগ্ন থাকে!

১৯০৮-১৯০৯ সনে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া যেসব রিপোর্ট পেশ করেছে, (প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় খিলাফতে আহমদীয়ার শুরু থেকে) তাতে দেখানো হয়েছে যে 'সিফাখানা' (চিকিৎসালয়) এর জন্য সর্বদাই একটি তহবিল থাকতো, আর এমন সব রিপোর্টও রয়েছে যে, এ তহবিল দ্বারা শত শত রোগীকে ডাক্তার দেখানো হোত এবং তাদেরকে ঔষধও প্রদান করা হতো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গুয়াতেমালায় নাসির হাসপাতালের সাম্প্রতিক যে উদ্বোধন (২৩ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ) করলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মানবতার সেবায় সেটি আরেকটি মাইলফলকরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

একশত বছর খুব দ্রুতই অতিবাহিত হয়েছে আর এখন আমরা যা দেখছি, তা হচ্ছে– জামাতের অনেকগুলো হাসপাতাল রয়েছে, যেগুলো তাদের নিজ নিজ দেশে ভাল ভাল সব হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলছে আর মানবজাতির সেবায় রত আছে।

খলীফা আল্লাহ্ তা'লা বানান

মাওলানা ফুরাদ আহমদ
মুরুব্বী সিলসিলাহ

পবিত্র কুরআন হতে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ তা'লা বলেন "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন (সূরা নূর: ৫৬)।

সুতরাং এই আয়াত হতে এটি বুঝা গেল যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা সপষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এখন মানব জাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক, সেই কারণেই তাঁর খেলাফত যেকোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর ওপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব।

খেলাফত তিন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন–

১। খেলাফতে নবুওয়াত: এই ধরণের খেলাফত নবী রাসূলদের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

২। খেলাফাতুন আলা মিনহাজির নবুওয়াত: যে খেলাফত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরে তার আনুগত্যের মাধ্যমে ফানাফির রাসূল হওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যাঁর ওপর ওহী ও ইলহাম হয়ে থাকে। যেমন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এটি লাভ করেছেন।

৩। ইনতেখাবিয়া বা ইনতেযামিয়া খেলাফত: এই ধরণের খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত খোলাফায়ে রাশেদীন ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পরে যাঁরা খলীফা হবেন তাঁরা এই খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, খলীফা স্থলাভিষিক্ত এবং স্থলাভিষিক্ত সত্যিকারভাবে সেই হতে পারে যে রসূলের কামালাত যিল্লিভাবে নিজের মাঝে অর্জন করেছেন। আল্লাহ তা'লা বাদশাহর নাম খলীফা রাখতে চান নাই কেননা খলীফা রসূলের হৃদয় হয়ে থাকে।

আরো বলেন, খলীফা স্থলাভিষিক্তকে বলে যিনি ধর্মের সংস্কার করেন। নবীদের যুগের পর অন্ধকার যখন এ ধর্মে অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং সেই অন্ধকারকে দূর করার জন্য ঐশী জগত হতে ঐ ধর্মে কোন সংস্কার আসে তাঁকে বলা হয় ঐ নবীর খলীফা।

খলীফা বা খেলাফত শুধু বংশগতভাবে হতে পারে না যেমন বাপের পরে ছেলে কিংবা ছেলের পরে নাতি কারণ খলীফা বানানো খোদার কাজ। আমরা সকলে অবগত আছি যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর চার খলীফার প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশের ছিলেন না। তেমনিভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পরে প্রথম খলীফা হযরত নূরুদ্দীন (রা.) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বংশের ছিলেন না।

আর শিয়ারা এই ভুলটা করেছে যে, তারা বলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে হযরত আলী (রা.)-ই হলেন খলীফা, অন্য তিন জন খলীফা হওয়ার যোগ্য নন।

এটি খোদা তা'লার সুন্নত যে নবীর মৃত্যুর পরে রিসালাতের বরকত প্রদান করার জন্য এবং রিসালাতের জ্যোতিকে দীর্ঘায়িত করার জন্য আল্লাহ তা'লা খেলাফতের সিলসিলাকে জারি করেন এবং খেলাফতের এই যে নেযাম বা সিলসিলা তা খোদা নিজের সত্তার দিকে আরোপ করেছেন যেমন কুরআনের যেখানেই খেলাাফতের বিষয় আসছে সেখানেই আল্লাহ তা'লা নিজের দিকে আরোপ করে বলেছেন "ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলীফা" অর্থ্যাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।

আবার কুরআনের অন্য আরেক স্থানে হযরত দাউদ (আ.)-কে খলীফা বানানোর বিষয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন, "ইয়া দাউদু ইন্না জায়ালনাকা খলীফাতান ফিল আরদ" অর্থ্যাৎ হে দাউদ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।

মানুষের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহ তা'লা তো আরো বহু কাজ করেন যেমন মানুষকে তো আল্লাই বানান। কিন্তু আমি খলীফা বানাই বলার মাঝে হিকমত কি? তার মানে হলো, আল্লাহ তা'লা তার কুদরতে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন যে খলীফা হওয়ার যোগ্য এবং তাঁকেই খলীফা নিযুক্ত করেন ও তাঁকে যোগ্য প্রমাণিত করেন।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন যে, যখন খোদা তা'লা বলেন খলীফা আমি বানায় তখন এটি কিভাবে হতে পারে যে, ওয়াদা তো খোদা করবে আর তা অন্য কেউ পূর্ণ করবে? এটি কখনো হতে পারে না। আর খলীফা বানানোর ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত থাকে না। না সে নিজে বাসনা করে, না কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে খলীফা

নির্বাচীত হয়। বরং অনেক সময় তো এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে খলীফা নির্বাচিত হয়, যখন তাঁর খলীফা হওয়া বাহ্যত অসম্ভব বলে মনে হয়। ওয়াদাল্লা হুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সলেহাত, স্বয়ং প্রকাশ করে যে খলীফা খোদা বানান কেননা যে ওয়াদা করে সে-ই বানিয়ে থাকেন। এটি কখনো হতে পারে না যে, আল্লাহ্ ওয়াদা করবেন আর অন্যরা তা পূর্ণ করবেন।

কিভাবে বুঝা যাবে যে খলীফা খোদা বানান?

এর উওর হলো, যে খলীফার মাধ্যমে ধর্মের উন্নতি এবং বিজয় সাধিত হচ্ছে মনে হয় তিনিই হলেন আল্লার খলীফা।

খলীফা খোদা বানান এর আরেকটি বড় প্রমাণ হলো, এক খলীফার বর্তমানে আরেকজন খলীফা হতে পারে না।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি বলেন, লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম-এর মানে হলো খলীফা খোদা বানান। যখন দুনিয়ার সংশোধনের জন্য খোদা তা'লা কোন খলীফার প্রয়োজনবোধ করেন তখন মানুষের মনে ইলহাম করেন যে, এমন ব্যক্তিকে খলীফা বানাও, যাকে খোদা খলীফা বানাতে চান।

খলীফা হওয়ার পূর্বে অনেক নারী-পুরুষ সপ্নে দেখেন যে, অমুক ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। যেমন খলীফাতুল মসীহ সালেস খলীফা হওয়ার পূর্বে একজন মহিলা স্বপ্নে তাকে খলীফা হতে দেখেছেন।

কাবাবিল জামাতের আমীর শরীফ আওদা সাহেব বলেন, আমি মসজিদে ফযলের পাশে দাঁড়ানো ছিলাম এবং দুইজন ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন এদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি, যিনি হলেন চৌধুরী হামিদুল্লাহ সাহেব উকিলে আলা তাহরিকে জাদীদ রাবওয়া। কিন্তু দ্বিতীয় জনকে আমি চিনি না। কিন্তু উনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিলো উনিই খলীফা হবেন। আমাদের বর্তমান হুযূর পঞ্চম খলীফা।

আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল আমীর সাহেবও পঞ্চম খলীফা নির্বাচনের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খলীফার জন্য কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করা হলো তাঁরা এক এক করে দাঁড়াচ্ছিলো। আমির সাহেব বলেন, যখন বর্তমান হুযূর দাঁড়ালেন আমার কাছে কেন জানি মনে হলো ইনিই খলীফা হবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: ভালো করে স্মরণ রেখো খলীফা খোদা বানান। যে বলে খলীফা মানুষ বানায় সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক।

হযরত উসমান (রা.) সমপর্কে খলীফা হওয়ার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন:

হে উসমান! খোদা তা'লা নিশ্চয় তোমাকে খেলাফতের জামা পরাবেন। মুনাফেকরা তোমার থেকে সে জামা কেড়ে নিতে চাইবে কিন্তু তুমি তা তাদের হাতে তুলে দিবে না, এমনকি এভাবেই আমার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। (তিরমিযি, কানযুল উম্মাল)

খলীফা খোদা বানান: মানুষের মনে এই প্রশ্নটি থেকেই যায় যে , আমরা তো দেখি খলীফা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে তাহলে কেন বলা হয় যে, খলীফা আল্লাহ বানিয়ে থাকেন।

এই প্রশ্নের উওর হলো, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি প্রথমে যে ভাষণ দেন তা হলো– "আমাকে আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য খলীফা বানিয়েছেন যেন এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং তোমাদের একতা সুদৃঢ় করা যায়।" (দারেরাতুল মারেফ, ৩য় খন্ড, পৃ: ৭৫৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয় বরং খোদার কাজ । হযরত আদমকে কে খলীফা বানালেন? আল্লাহ তা'লা বলেন "ইন্নি জয়েলুন ফিল আরদে খলীফা" আদমের খেলাফতের উপর ফেরেশ্‌তারা আপত্তি তুলল যে, তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে ফাসাদ ছড়াবে এবং রক্তপাত ঘটবে কিন্তু তারা আপত্তি করে কি ফল পেলো। তোমরা কুরআন পড়ে দেখ অবশেষে তাদেরকে আদমের সেজদা করতে হলো কিন্তু কেউ যদি আমার ওপর আপত্তি করে আর সে যদি কোন ফেরেশ্‌তাও হয় তাহলে আমি তাকে বলবো আদমের খেলাফতের সামনে সেজদাবনত হয়ে যাও কেননা এটিই উওম। যদি সে অস্বীকার করে ইবলিস হয়ে যায় তাহলে স্মরণ রেখো আদমকে অস্বীকার করে ইবলিসের কি লাভ হলো।

খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন, আমাদের বিশ্বাস হলো খলীফা খোদা তা'লা বানান। যদি এটি মানুষের কাজ হতো তাহলে তারা যাকে ভালো মনে করত তাকে খলীফা বানাত কিন্তু খলীফা স্বয়ং আল্লাহ বানান এবং তার নির্বাচনে কোন ত্রুটি নেই। খোদা তাঁর এমন দুর্বল বান্দাকে নির্বাচন করেন যার সম্পর্কে দুনিয়া ভাবে তার কোন জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, বুযূর্গি, পবিত্রতা ও তাকওয়া নেই এবং তারা তাকে অনেক দুর্বল ও তুচ্ছ ভাবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'লা তাকে নির্বাচিত করে নিজের প্রতাপের বহি:প্রকাশ ঘটান।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি যে আমি কখনো মানুষের কাছ থেকে খেলাফতের বাসনা করি নাই এমনকি খোদা তা'লা কাছ থেকেও আমি এটি চাইনি যে তিনি আমাকে খলীফা বানান বরং এটি খোদা তা'লার আমার উপর তার ফযল ছিলো। এটি আমার আবেদন ছিলো না বরং আমার আবেদন ছাড়াই এই দায়িত্ব আমার কাঁধে ন্যস্ত করা হয় এবং এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনি অধিকাংশ মানুষের গর্দান আমার সামনে নত করে দিলেন। অতঃপর আমি আশ্চর্য হলাম যে আমার মত অযোগ্য মানুষকে তিনি কিভাবে পছন্দ করলেন। যাহোক তিনি আমাকে পছন্দ করে বেছে নিলেন এবং কোন মানুষ এই পোশাককে আমার কাছ থেকে খুলে নিতে পারবে না যা তিনি আমাকে পরিধান করিয়েছেন।

খিলাফত: মানবজাতির জন্য এক আশীর্বাদ

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-র মিশনের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে , আর তা হল– খোদা এবং মানবজাতির মাঝে এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, আর এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে মানুষ তাদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছে। এ উভয়বিধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজে তিনি নিজ জীবনের পুরোটা কাল অতিবাহিত করেছেন।

তার তিরোধানের পর তার খলীফাগণ এ মিশনকে কৃতকার্যতার সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হুযূর(আই.)-র যে সফর, তা এ বিষয়টিকে বাস্তব এক উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে যে, খিলাফতে আহমদীয়া কী উত্তমভাবে বিভিন্ন উপায়ে উপরোক্ত উভয় ফ্রন্টে সেবা দান করে চলছে।

আফ্রিকা, এশিয়া এবং বিশ্বের পিছিয়ে পড়া অনেক অংশেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানবহিতৈষী যেসব সেবাকর্ম করে চলছে, সে বিষয়ে বর্তমান বিশ্ব সম্যক অবহিত। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত সেসব অঞ্চলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' অবিরত সেবা দান করে চলেছে।

এসব প্রচেষ্টার খবর এম.টি.এ- নিউজ এবং জামাতের বিভিন্ন সংবাবদপত্র ও সাময়িকীর মাধ্যমে প্রকাশ পেলেও জনগণের মনোযোগ যে বিষয়টির দিকে কদাচিৎ আকৃষ্ট হচ্ছে, সেটি হল পুরোদস্তর

ফিলাডেলফিয়ায় মসজিদ আফিয়্যাত উদ্বোধনের পর অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ইসলামী দিকনির্দেশনা সম্বলিত বক্তব্য দিচ্ছেন

আন্তর্জাতিক এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' বিশ্বজুড়ে নানান কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মপরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নের পর অনুমোদনের জন্য তা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ এর নিকট উপস্থাপন করা হয়, সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা কামনা করা হয় এবং তাঁর আশিসময় অনুমোদনপ্রাপ্তির পর সেগুলো যথারীতি কার্যে পরিণত করা হয়।

খুব কমসংখ্যক লোকই জানতো যে গুয়াতেমালায় বসবাসকারী সেন্ট্রাল আমেরিকার লোকদের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। ২৩ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে হুযূর (আই.) এ হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন আর তখনই সমগ্র বিশ্ব দেখতে পায় যে, সে অঞ্চলের মানুষের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ কত সুন্দর এক উপহার উপস্থাপন করলেন।

এ হাসপাতালটি হচ্ছে এর সার্বিক অর্থেই এমন এক সেবা-প্রতিষ্ঠান, যেটি সেসব মানুষকে চিকিৎসা-সেবা দান করবে, যাদের সেটি প্রয়োজন। খিলাফতে আহমদীয়ার লোকহিতকামী মহান সেবা দানে অংশগ্রহণে 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' এ সুযোগ লাভ করেছে। মানব-সেবার যে উদ্দেশ্য তা বাস্তবায়নে খিলাফতে আহমদীয়া কতটা কর্তব্যনিষ্ঠ মহান এক ঐশী প্রতিষ্ঠান, এ ঘটনাটি হচ্ছে তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আর এটি হচ্ছে সেসব প্রমাণের মধ্যে একটি, যা বিগত ১৩০ বছর ধরেই সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে আসছে।

আমেরিকা সফরের পরবর্তী সময় জুড়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তিনটি মসজিদ উদ্বোধন করেছেন, যার একটি হচ্ছে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয়টি বাল্টিমোর এবং তৃতীয়টি ভার্জিনিয়ায়, সবখানে তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাতে স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিকবৃন্দ ও স্থানীয় অধিবাসীগণ মসজিদ নির্মাণে আহমদীয়া জামাতের দর্শন সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ (আই,)-র দিকনির্দেশনা সম্বলিত কথাবার্তা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করে। মানবজাতিকে সৃষ্টিকর্তার সাথে সংযুক্ত করার যে উদ্দেশ্য , তা কত সুন্দরভাবেই না সাধিত হচ্ছে, এসব ঘটনা তারই প্রামাণ্য সাক্ষ্য হয়ে বিরাজ করছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এটি ৪র্থ সফর, কিন্তু যে বার্তাটি তিনি সেখানে প্রদান করে চলছেন, সেটি হচ্ছে তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী এক বার্তা, আর তার এ উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়টিই হচ্ছে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা এবং তিনি যে নির্দেশ দান করেছেন, তা পালনে সদা তৎপর থাকা।

আমাদেরকে এটি ভুলে গেলে চলবে না যে, এটি হচ্ছে সেই আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে ইসলামের ছদ্মাবরণে কতিপয় দৃষ্কৃতকারী নির্মমভাবে হিংসাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিল। টুইন টাওয়ারের সেই আক্রমণে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

টুইন টাওয়ারে নারকীয় হামলা

দুষ্কৃতকারীরা এ দাবী করে যে, এ আক্রমণের মাধ্যমে তারা আমেরিকাবাসীদেরকে এ কথাই জানান দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, ইসলাম ধর্মে জিহাদের উদ্দেশ্যটি কী! সত্যিকার ইসলামী জিহাদে রয়েছে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী শিক্ষা, যা নিয়ে আমাদের মাঝে রয়েছেন খলীফাতুল মসীহ্, যিনি হচ্ছেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা, আর তিনি আমেরিকার জনগণের কাছে যাচ্ছেন সেই একই 'জিহাদ' নিয়ে, কিন্তু তা ভিন্ন এক পদ্ধতিতে, যেটি কেবল সম্ভাব্য উত্তম পন্থাই নয়, বরং তা ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর রীতিরই পূর্ণ অনুসরণ। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি বিশ্বকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-ই হচ্ছেন শান্তির শাহজাদা আর ইসলামের নামে যে সন্ত্রাসবাদ, তা ক্রুর হিংসা থেকে সৃষ্ট, আর এর সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

আজকের এ দিনে, যখন বিশ্বকে এ সত্যটি কথা ও কাজের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন, ঠিক তখনই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) এর ৫ম খলীফা ইসলামের সেবায়-দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে বিশ্বকে এ কথাটি স্মরণ করাচ্ছেন যে, হিংস্রতাকে ইসলামের সাথে যুক্ত করাটা মারাত্মক এক ভুল ধারণা। সংবাদ-মাধ্যমসমূহ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, বুদ্ধিজীবি বৃন্দ এবং বিশ্বের সকল অংশের জনসাধারণের সাথে, বিশেষ করে পশ্চিমাবিশ্বের মানুষের সাথে তিনি কথা বলছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের এ অবান্তর ধারণা তিনি দূরীভূত করে চলছেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-কে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করে অসাধারণ সফলতায় অভিসিক্ত করুন আর বিশ্ব অচিরেই ইসলাম আহমদীয়াতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিক; পরম করুণাময় সমীপে একান্তভাবে এটাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন, প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(৩০তম কিস্তি)

মসজিদ বায়তুর রহমান খুলনায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হল

আমাদের মসজিদে ৮ অক্টোবর ১৯৯৯ শুক্রবার ঠিক জুমআর নামাযের সময় যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখছি। এই বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে নিবেদিত প্রাণ আমার প্রিয় দুই যুবক নুরুদ্দীন ও জাহাঙ্গীর হোসেন জায়েনামাযে বসে বসেই শহীদ হয়েছিলেন। তারপর এক এক করে হাসপাতালে গিয়ে আরো পাঁচজন শহীদ হলেন।

বোমা বিস্ফোরণের পেছনের কথা

আমি নিয়মিত মাসে ১৫দিন খুলনা বিভাগের জামাতগুলো সফর করছিলাম। কোলদিয়াড় গ্রামে, ভেড়ামারা জেলা কুষ্টিয়ার একটি গ্রাম, এখানে একটি বড় জামাত আছে। ১৯৭৩ সালে এই জামাত কায়েম হলে এর নাম 'নাসেরাবাদ' রাখা হয়েছিল। বড় নিবেদিতপ্রাণ আহমদিদের জামাত ছিল এটি। আমি ১৯৮৯-৯১ এর যুগে বেশ কয়েকবার এখানে গিয়েছিলাম। সবার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। এই জামাত খুলনা রিজিওনের অধীনে ছিল।

১৯৯৮ সনে এখানে ভয়াবহ বিরোধীতা আরম্ভ হয়েছিল। জামাত যখন গঠিত হয়েছিল তখনও কঠোর বিরোধীতা হয়েছিল। পাকিস্তানে ১৯৭৪ সনের মে মাসে বিরোধীতার আগুন জ্বালানো শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সনের মার্চ মাসে নাসেরাবাদ মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

এবার যে বিরোধীতা আরম্ভ হোল-দীর্ঘ সময় জুলুম অত্যাচার চলতে থাকল। এত কঠিন অত্যাচার চালানো হল যে বাধ্য হয়ে অধিকাংশ আহমদি ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে আত্মীয়দের বাসায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেব এবং জামাতের নেতৃস্থানীয়রা উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করলেন। কিন্তু কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছিল না। বিরোধীদের অত্যাচার নিরসনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

খাকসার হামেশা পাকিস্তানের অত্যাচারিত আহমদীদের জন্য যেমন দোয়া করতাম নাসেরাবাদের জন্যও দোয়া করে যাচ্ছিলাম। অবশেষে আমার মনে আসল যে, আল্লাহতা'লা চাচ্ছেন, আমরা যেন শাহাদত বরণ করি। অর্থাৎ আমরা শহীদ হতে প্রস্তুত হই।

আমি রাবওয়া হতে যখন ফেরত আমার দেশে এসেছিলাম তখন খুব লক্ষ করেছিলাম যে, ১৯৭৪ সন থেকে পাকিস্তানী আহমদীদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চলেছে, যেভাবে হাজার হাজার আহমদীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, অগণিত আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের জামাতগুলোর মাঝে বেদারী সৃষ্টি হয়নি। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, আমরা যেন শাহাদত বরণ করি। আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। কারণ যারা শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত নয় আল্লাহ্ তা'লা তাদের শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেন না।

আমি নিয়মিত শহীদ হওয়ার জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করেছিলাম। এটা তো হতে পারে না আমি নিজে শহীদ হবার জন্য দোয়া করব না- আর দোয়া করব অন্য কেউ যেন শহীদ হন। এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু বলিনি।

আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি চট্টগ্রামে যখন থাকতাম তখন পটুয়াখালী থেকে এক ভদ্রলোক বয়স সম্ভবত: আমার চেয়ে সামান্য বেশী হবে হয়ত, আমার সাথে কয়েকবার দেখা করে আহমদীয়াতের সত্যতা যাচাই করেছিলেন। একদিন বললেন যে, আমি আহমদি হতে চাই। আমি বললাম বয়াত করেন। তিনি বললেন-চট্টগ্রামের সাথে আমার যোগাযোগ কঠিন। খুলনায় আমার অনেক যাতায়াত আছে, খুলনা জামাতের সদস্য হলে আমার সুবিধা হবে। আমি তার ঠিকানা রেখে বললাম, আমি তারিখ দিলে আপনি ঐ তারিখে খুলনা পৌঁছে যাবেন।

ভদ্রলোকের নাম স্মরণ নাই অর্থাৎ ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি। আমি যথাসময়ে তাকে পত্র দিলাম যে আপনি ৮ অক্টোবর শুক্রবার আমাদের খুলনা মসজিদে জুমআর নামাযে উপস্থিত থাকবেন। সম্ভবত: শুক্রবার সকালে তিনি আমাদের মসজিদে পৌঁছে গেলেন। বয়াত ফর্ম পুরণ করলেন, জুমআর নামায শেষে সকলে মিলে বয়াত

বোমা হামলার পর মসজিদের চিত্র, মসজিদ বায়তুর রহমান, খুলনা

করা হবে। কিন্তু জুমআর নামায তো হোল না। বোমা বিস্ফোরণ হয়ে গেল। ঐ ভদ্রলোক মসজিদে ছিলেন কী না জানি না। তবে একজন বলেছিলেন যে মসজিদের শেষের সারিতে ঐ লোককে দেখা গেছে।

তবে পরের দিন দুপুরে আমি অ্যাম্বুলেন্সে পড়েছিলাম। ঐ ভদ্রলোক এসে আমার সাথে দেখা করলেন। আমি তাকে বললাম অক্টোবরের অমুক তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদে আসুন- মজলিস আনসারুল্লাহ'র ইজতেমায় অংশগ্রহণ করবেন। বয়াতও করবেন। কিন্তু তারপরে আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আমি প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করে যাচ্ছিলাম, "ইয়া আল্লাহ! আমি শহীদ হতে প্রস্তুত। তুমি নাসেরাবাদ জামাতের আহমদিদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চলছে তা শেষ কর। আহমদীদের অলৌকিক সাহায্য কর। কিন্তু ৬ বা ৭ অক্টোবর তাহাজ্জুদের দোয়ার মাঝখানে মনে পড়ল- আমি আমার শহীদ হবার জন্য দোয়া করছি- এমনও তো হতে পারে যে আমার শহীদ হওয়া আল্লাহ মঞ্জুর করবেন না। তখন ঐ সিজদার মধ্যেই দোয়া করতে আরম্ভ করলাম যে, যদি আমার শাহাদাত মঞ্জুর না কর তাহলে এমন লোক প্রস্তুত কর যারা শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। কে কবে শহীদ হবেন ধারণা করা যায় না। কবে কোথায় কার উপর আক্রমণ হতে পারে তার কোন ধারণা আমার ছিল না।

পরের দিন ৮ অক্টোবর শুক্রবার আমি জুমআর খুতবা পাঠ করছিলাম, খুতবা প্রায় শেষ, এমন সময় মসজিদে পূর্ব থেকে সেট করে রাখা টাইম বোমা বিস্ফোরিত হল। আমি মেহরাবের ভেতরে খুতবা দিচ্ছিলাম- হঠাৎ অতি উচ্চ বিকট শব্দ শুনতে শুনতে পড়ে গেলাম। আমার খুব কাছে বিদ্যুতের সুইচবোর্ড ছিল। আমি ভাবলাম যে, সম্ভবত: বিদ্যুতের তারের সংঘর্ষ হয়েছে। আমি চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকলাম- কেউ আসল না। আমি ভয় পেলাম কী হয়েছে জানি না-এভাবে ওখানে পড়ে থাকলে হয়ত মারাও যেতে পারি কেউ জানবে না। আমি খুব দ্রুত মেহরাব ছেড়ে মসজিদের মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে মসজিদের বাইরে চলে আসলাম। আমি মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে পড়লাম। সিঁড়ি থেকে বুকে হেঁটে অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে লক্ষ করলাম আমার পা হাঁটুর সাথে ঝুলছে। আমি নিচে আসার সাথে সাথে দুই তিন জন খোদ্দাম আমাকে ধরে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেল। দুজনে রিকশার উপর আমাকে নিয়ে বসে শহরের দিকে যাত্রা করল। বড় সড়কে আমরা আসলাম। রোডের উপর একটি মোটর কার দেখলাম। খোদ্দামরা ঐ গাড়ির সাথে দাঁড়ানো ড্রাইভার বা গাড়ির মালিককে ডাকল যে আমাকে গাড়িতে নিতে। গাড়িওয়ালা রাজি হল না। সাইকেল রিকশা করে আমরা প্রধান সড়কের উপর চলতে শুরু করলাম।

রাস্তায় একটি বাস পেলাম- বাসটি সাতক্ষিরার দিক থেকে সোনাডাঙ্গা বড় বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। খোদ্দামরা আমাকে বাসের ভিতরে মেঝের উপর শুইয়ে দিল। বড় বাসস্ট্যান্ডে এসে গেলাম। তারপর বাস থেকে আমাকে নামান হল।

একটি গাড়ি সম্ভবতঃ যেমন তেমন একটি মাইক্রোবাসের মত গাড়িতে আমাকে তুলে হাসপাতালের দিকে যেতে থাকল। অবশেষে খুলনার সবচেয়ে বড় নতুন সরকারী হাসপাতালে পৌঁছে গেলাম। আমাকে হাসপাতালের বারান্দায় ফেলে রাখা হল। হাসপাতালে কোন ডাক্তার, কোন কর্মকর্তা, কোন কর্মচারীকে পাওয়া গেল না। বলা হল নতুন হাসপাতাল-সবাই জুমআ পড়তে গেছেন। আমি বারান্দায় পড়ে থাকলাম। খোদ্দামরা আমাকে বলল মসজিদে বোমা ফেটেছে। কি হয়েছে জানি না-মুরুব্বী সাহেব! আপনি থাকুন- আমরা মসজিদে গিয়ে দেখি সেখানে কী হচ্ছে। কী ঘটেছে।

প্রথমে আমি জানতে পারিনি বাস্তবে কী ঘটেছে। আস্তে আস্তে শুনতে থাকলাম, বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। নিবেদিতপ্রাণ দুই যুবক জাহাঙ্গীর হোসেন ও নুরুদ্দীন ঘটনাস্থলে সাথে সাথেই শহীদ হয়েছেন। তারপর এক এক করে হাসপাতাল যেতে যেতে অথবা হাসপাতাল গিয়ে জনাব সোবহান মোড়ল, জনাব মুহিবুল্লাহ, জনাব ডাঃ আব্দুল মাজেদ, জনাব জী.এম. আকবর আলী শহীদ হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমি একেবারে খালি মেঝেতে পড়ে রইলাম। কোন ডাক্তার বা হাসপাতালের কেউ আমাকে কোন মেডিকেল এইড দিলেন না। জামাতের কেউ কেউ এসে দেখে যাচ্ছিলেন। যেহেতু এতজন শহীদ হচ্ছিলেন, আরো অনেক আহতদের হাসপাতালে নেয়া বা দেখাশোনা করতে হচ্ছিল-জামাতের সদস্যরা এতজন ছিলেন

বোমা হামলার পর আহত অবস্থায় লেখক, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ৯ অক্টোবর ১৯৯৯

না যে আমার কাছে কেউ থাকবে। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওভাবেই পড়ে থাকলাম। আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত সজাগ বা সজ্ঞানে ছিলাম। কেউ বিশ্বাস করেন বা না করেন আমার কোন কষ্ট হচ্ছিল না, ব্যথা বা যন্ত্রণা হচ্ছিল না। আমার পা এত ভাঙ্গা ছিল যে পরের দিনের পরের দিন কেটে ফেলা হয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ব্যান্ডেজ বা কিছুই করা হয়নি। রক্তপাত নিশ্চয় হয়েছে। আমি মোটেই ভয় পাচ্ছিলাম না। পিঠেও ক্ষত ছিল। কোন দুঃখ কষ্ট হচ্ছিল না। বড় নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এমন তো হবারই ছিল। কতবড় আশ্চর্যের বিষয়! দুপুর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐভাবে পড়ে রইলাম অনেক রক্তপাত হয়ে মারা গেলাম না।

কিছুক্ষণ পর পর মৃত্যুর কথাও মনে পড়েছে যে, মারাও যেতে পারি। তখন দোয়া পড়ছিলাম, দরুদ শরীফ পড়ছিলাম। মৃত্যুর কথা মনে পড়লে খারাপ লাগছিল যে, যথেষ্ট পরিমান দরুদ পাঠ করা হয়নি। কিছুকাল পূর্বেই তো বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছিলাম যে, অনেক বেশী দরুদ পাঠ করতে হয়। এখন মারা গেলে তো সে হিসাবে যথেষ্ট পরিমান দরুদ শরীফ পড়া হয়নি।

তখনো অজ্ঞান হইনি। একজন সম্মানিত পরিচিত মহিলা আসলেন, হিরন সাহেবের স্ত্রী, সাঈদ সাহেবের ছোট ভাই হিরণ সাহেব। খালেসপুরে থাকতেন (অনেক আগেই আমেরিকা চলে গেছেন)। বললেন, কী সাহায্য করতে পারি। বললাম, সম্ভব হলে ARNICA-CM (আরনিকা সিএম) এনে মুখে দিয়ে দিবেন। তারপর আমি কখন অজ্ঞান হয়েছি জানি না।

পরে শুনেছি যে সন্ধ্যার পরে কোন সময় ডাক্তার বা কেউ এসে আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে ভাঙ্গা পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন যেন ঢাকা যাওয়া পর্যন্ত ভাল থাকি।

গভীর রাতে একবার জ্ঞান ফিরেছিল। দেখি আমরা বহুজন একটি বড় হলে, হাসপাতালের বড় হলে বেড়ে শুয়ে আছি। আমার পাশে মনতাজ ভাই (মোয়াজ্জেন) জোরে জোরে কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এত কাঁদেন কেন? বললেন, বড় যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।

(চলবে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর দোয়া সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

লেখক: **মোকাররম মাহমুদ মুজিব আযগর সাহেব।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মানুষকে দুর্বল ও শক্তিহীন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও নিজের শক্তি সামর্থের মাধ্যমে এরূপ উঁচু মর্যাদা ও সাফল্য অর্জনের দাবি করা খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য দোয়ার অনেক বেশি প্রয়োজন। (আল হাকাম ২৪ সে সেপ্টেম্বর ১৯০৪ইং)

দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার অপার শক্তি নিহিত রেখেছেন। খোদা তা'লা আমাকে বার বার ইলহাম করে বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে। আমাদের অস্ত্র তো শুধুমাত্র দোয়া। আর এটা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো অস্ত্র নেই। যা কিছু আমরা খোদার কাছে গোপনে চাই খোদা তা'লা তাই বাস্তবে তা প্রতিফলিত করে দেন। দোয়ার চেয়ে বড় আর কোন অস্ত্র নেই। (সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ– লেখা হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) পৃষ্ঠা : ৫১৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাগণ বিভিন্নভাবে দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত প্রবন্ধটিতে দোয়া সম্বন্ধে দ্বিতীয় কুদরতের তৃতীয় প্রকাশক হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা সম্মানিত পাঠকগণের কাছে উপহার স্বরূপ পেশ করা হল–

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর একটি প্রাথমিক ও মৌলিক নির্দেশনা: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ ইং তারিখে জামাতের ইমামের আসন গ্রহণ করার পর প্রথম সালানা জলসায় এই ঘোষণা দেন যে, আমার দোয়া সর্বদা আপনাদের সাথে আছে আর আমি সর্বদা আপনাদের দোয়ার কাঙ্গাল। আমি আপনাদের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য আপনাদের বোঝা হালকা করার জন্য আপনাদের পেরেশানি দূর করার জন্য আমার অযাচিত অসীম দানকারী প্রভু প্রতিপালকের নিকট দোয়া কবুলিয়্যতের নিদর্শন প্রার্থনা করছি আর ঐ পবিত্র সত্তার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা আছে যে, তিনি আমার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করবেন।" (উদ্বোধনী বক্তৃতা জলসা সালানা ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ইং)।

আল্লাহ্ তা'লার রহমত অর্জনের দ্বার: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৫ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে তার রহমত সমূহ অর্জনের জন্য অসংখ্য দ্বার খুলে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার ফযলসমূহ দান করতে কখনো কৃপণতা করবেন না। এই আমরাই যারা নিজেদের থলে সংকুচিত করে ফেলি এবং নিজেদের হাতের মুঠি বন্ধ করে ফেলি এবং তার সামনে নিজেদের হাতপাতি না। (জলসা সালানার খেতাব, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৫)

দোয়ার শর্তসমূহ: ১৯৬৮ ইং সনের মজলিসে সূরাতে হুযূর (রাহে.) বলেন, "দোয়ার জন্য সবচেয়ে জরুরী বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষ যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার উদ্দেশ্য বিলীন করে দেয় এবং সে যেন মনে করে যে তার কোন প্রকার শক্তি ও সমর্থ নেই তা না হলে শিরক এর কিছু কিছু সূক্ষ্ম অংশ মানবের নফসের ভিতর থেকে যায়। আর যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত মনে করে নিজেকে সম্পূর্ণ মূর্খ জ্ঞান করে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন ও অধম মনে করে তাঁর প্রতি বিনত হই তাহলে ঐ মহাশক্তিশালী ও সর্ব শক্তিমান খোদা। ঐ অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী খোদা আমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন আর আমাদেরকে শক্তিও সমর্থও প্রদান করবেন। (রিপোর্ট মজলিসে শূরা, ১৯৬৮)

প্রত্যেক মুহূর্তে দোয়ার প্রয়োজনীয়তা: দোয়া সম্বন্ধে হুযূরের একটি প্রবন্ধে দোয়ার বিষয়টি খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। তিনি (রাহে.) বলেন, "দোয়া ছাড়া আমাদের জীবন কোন জীবনই না। দোয়া

ছাড়া আমরা খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি না।... আল্লাহ্ তা'লা যে রকম ঐশ্বর্যশালী সত্তা তিনি আমাদের কিইবা তোয়াক্কা করবেন। দোয়াই একমাত্র অবলম্বন যার মাধ্যমে আমরা তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। যা তার ভালবাসার মধ্যে এক প্রকার গতি সঞ্চার করে আর যেহেতু আমাদের মত দুর্বল ও অসহায়ের দোয়াও দুর্বল হয়ে থাকে তাই আমরা ধীরে ধীরে তার দিকে ধাবমান হতে থাকি। তিনি সকল কুদরতের মালিক যখন তিনি কোন কিছুর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন ঐ সমস্ত কুদরতের সাথে খুব দ্রুত সামনে ধাবমান হন।

দোয়ার এই উঁচু মাকাম থেকে আমরা যেন কখনো পিছপা না হই: খোদা তা'লা যেন এমনই করেন যে আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি আর আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা ও অসহায় সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি। খোদা তা'লা যেন এমনই করেন যে, শির্ক এর কোন প্রভাব যেন আমাদের হৃদয় ও আমাদের চিন্তা ভাবনা ও আমাদের রূহের মধ্যে না পড়ে। আর আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে এবং আমাদের রূহের মাঝে আর আমাদের চরিত্রের প্রত্যেক দিকে যেন খোদা তা'লার একত্ববাদের প্রকাশ পায় আর তা যেন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা যেন এমনই করেন যে, আমরা দোয়ার এই উঁচু অবস্থান থেকে কখনো পিছপা না হই যেন শয়তানের কোন আক্রমণই আমাদের ওপর সাফল্য লাভ করতে না পারে। (রিপোর্ট মজলিসে শূরা, ১৯৬৯ ইং, পৃষ্ঠা ২৭৬-২৮০)।

উত্তম তদবিরও এক প্রকার দোয়া: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, উত্তম তদবিরও দোয়ার অন্তর্ভুক্ত। আমার এক প্রকার তদবির এমন যে আমি আমার চিন্তা-ভাবনা বন্ধুদের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করি যে, তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যায়। এটাও এক প্রকার তদবির যা আমি বুঝানোর চেষ্টা করে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, যে ভালো নিয়তের মাধ্যমে তদবির করতে থাকে তাও এক প্রকার দোয়া। তিনি (আ.) আরো বলেন দোয়ার অপর নাম উত্তম তদবির আর উত্তম তদবিরই হল দোয়া।

দোয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন: অতএব দোয়াকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে ফেলুন। দোয়াকে নিজের খোরাক বানিয়ে ফেলুন। দোয়াকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস বানিয়ে ফেলুন। দোয়াকে নিজের ঘুম বানিয়ে ফেলুন। প্রত্যেক বিষয়কেই দোয়া বানিয়ে ফেলুন আর দোয়ার মাধ্যমে নিজের প্রভু-প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করুন।"

মানবজাতির জন্য হুযূরের দোয়া: আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের বংশধরদের সাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির জন্য আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক মানসিক এবং শারিরীক ভাবে প্রকৃত আনন্দ ও প্রফুল্লতার বন্দোবস্ত করুন। মানুষের মধ্যে যে পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরী হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করার বন্দোবস্ত করুন। (বক্তৃতা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪ইং)।

মাতৃভূমির জন্য দোয়া: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস বলেছেন, পাকিস্তানের সুরক্ষার জন্য হে বন্ধুরা অবশ্যই দোয়া করুন। (বক্তৃতা ২১ ডিসেম্বর, ১৯৬৫) দোয়ার মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীল অবস্থার বন্দোবস্ত করার পুরু দায়িত্ব জামাতের আহমদীয়ার ওপর এসে বর্তায় এই জন্য এই তিক্ততা যা মাতৃভূমির কিছু অবুঝ সৎ ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমাদের জীবনে তৈরি হয়েছে তা আমাদেরকে দোয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না। (বক্তৃতা ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ ইং)

হে খোদা! এই দেশের মধ্যে দৃঢ়তা তৈরি কর। এই দেশকে পরিপাক বানাও। এই দেশে বসবাসকারীদের জন্য তোমার রহমতের বন্দোবস্ত কর। তোমার ফজল দ্বারা এদের প্রতি-পালন কর। এদের আমল এমন বানিয়ে দাও যা তোমার কাছে কবুল হয়ে থাকে আর তারা যেন তোমার সন্তুষ্টি ও তোমার ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। (বক্তৃতা ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং)

"(প্রকৃত ধর্ম) দোয়ার জন্য কোন জায়গা বা সময় নিদৃষ্ট করে দেয় নি। মানুষ সব সময় ও সকল স্থানে দোয়া করতে পারে। কিছু ছোট ছোট ব্যতিক্রম আছে যা বলারও অপেক্ষা রাখে না। অতএব আপনারা সর্বদা দোয়াতে রত থাকুন। মন তেকে দোয়া করুন। অন্যদের জন্য দোয়া করুন। আমাদের (মুরব্বী সাহেবান) যারা অন্যান্য দেশে রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করুন প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নফস যা আহমদী হয়ে গেছে তা যদি খোদা তা'লার চোখে পাক পবিত্র হয়ে যায় তবে আমাদের আর কীইবা দরকার আছে। আমাদের তো শুধুমাত্র খোদা তা'লার ভালোবাসার দরকার।

খোদা তা'লা যেন এমনই করেন যে, আমাদের মধ্যকার প্রত্যেকের খোদা তা'লার ভালোবাসা অর্জন হয়ে যায়। ফেরেশতা আমাদের প্রত্যেকের ওপর যেন খোদার রহমত নিয়ে নাযিল হয়। আমাদের বাচ্চাদের ওপর, আমাদের বড়দের ওপর, আমাদের পুরুষদের ওপর এবং আমাদের মহিলাদের ওপরও যেন খোদা তা'লার রহমত নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেন শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন। আর যেন মন্দ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন আর যেন ইসলামী আহকামের ওপর আমল করার শক্তি দান করেন। এবং তার ফযল ও রহমতের উত্তরাধিকারী যেন আমাদের বানায় আল্লাহুম্মা আমীন।" (বক্তৃতা ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং)

অনুবাদক: **মুহাম্মদ কামরুজ্জামান**
মুরব্বী সিলসিলা

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পরিণতি

পাকিস্তান

হাসান ফেরদৌস
যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি

আসিয়া বিবি, আসিয়া বিবি জানে আপাতত বেঁচে গেছেন, কিন্তু তাঁর শেষ রক্ষা হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

দীর্ঘ ৯ বছর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘাড়ে নিয়ে তিনি দিন কাটিয়েছেন। সম্ভবত জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ব্লাসফেমি বা ধর্মীয় অবমাননাকর মন্তব্য করার অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তি পেয়েও মৃত্যুর কালো ছায়া এখনো তাঁর পিছু ছাড়েনি। পাকিস্তানে দাবি উঠেছে, তাঁকে ফাঁসি দিতে হবে। শুধু তাঁকে নয়, যে বিচারকেরা তাঁর মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদেরও ফাঁসি চাই। দেশের সেনাবাহিনীর প্রধানেরও ফাঁসি চাই, কারণ তিনি আহমদিয়া। এসব নিয়ে এখন সারা পাকিস্তানে তুলকালাম কাণ্ড চলছে।

৪৭ বছর বয়সী আসিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্রামের কুয়া থেকে পানি খেতে গিয়ে স্থানীয় নারীদের সঙ্গে বচসার সময় তিনি মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে কুৎসা রটনা করেছেন। আসিয়া একজন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, নিরক্ষর, দরিদ্র গ্রাম্য নারী। কোনো প্রমাণ ছাড়া, এক স্থানীয় মৌলভির অভিযোগের ভিত্তিতে ২০০৯ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১০ সালে পাঞ্জাবের একটি স্থানীয় আদালত তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেন। সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হলে লাহোর হাইকোর্টের বিচারকেরা সে রায় সমর্থন করে ফাঁসির আদেশ বহাল রাখেন। প্রায় এক দশক পর গত মাসে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট সে আদেশ বাতিল করে আসিয়াকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেন। তারপর থেকেই দেশটিতে এক মহা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডের শুরু।

অবশ্য দক্ষযজ্ঞ শুরু আসিয়া বিবির নামে অভিযোগ ওঠার পর থেকেই। তাঁর পক্ষে দুকথা বলেছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসির। ২০১১ সালে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর সেই দেহরক্ষী মুমতাজ কাদরীকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তবে মানুষ খুন করে তিনি রাতারাতি পাকিস্তানিদের চোখে অতি সম্মানিত ধার্মিক পীর বনে যান। মুমতাজ কাদরী খুন করে এতটা পূজনীয় হয়ে ওঠেন যে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা উঠলে সে মামলায় লড়তে সম্মত হন, এমন কোনো আইনজীবী খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শুধু সালমান তাসির নন, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রী শাহবাজ ভাট্টিও একই কারণে নিহত হন। তিনিও সালমান তাসিরের মতো আসিয়া বিবির পক্ষ নিয়েছিলেন, ব্লাসফেমি আইনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এই আইনের অপব্যবহার হচ্ছে। আইনটা এমনভাবে লেখা যে শত্রুতাবশত ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযোগ এনে যে কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। এই আইনের ফলে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা। তাদের নামে অভিযোগ করা সহজ, আর অভিযোগ করলেই সবাই তা সত্য বলে বিশ্বাস করে। শাহবাজ জানতেন, এ কথা বলার জন্য তাঁর মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর চার মাস আগে রেকর্ডকৃত এক অন্তিম বক্তব্যে তিনি বলেন, মৃত্যু হলেও তিনি সংখ্যালঘুদের অধিকার সমর্থন করে যাবেন। তিনি ও সালমান তাসির যে পিপলস পার্টির সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সরকারের কেউ মুখ ফুটে এ নিয়ে একটি কথাও বলেননি। উল্টো ব্লাসফেমি আইনের সাফাই গেয়ে বলেছিলেন, এই আইন বদলের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যেমন আইন, তেমনি থাকবে।

৯ বছর জেলে থাকার পর আসিয়া মুক্তি পাওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে শুধু বিচারকদের নয়, যে উকিল তাঁর পক্ষে ওকালতি করেছেন, তাঁকেও দেখে নেওয়া হবেএমন হুমকি দিয়েছিলেন তেহরিক-ই-লাব্বায়েক দলের প্রধান আফজাল কাদরী। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এই হুমকির প্রতিবাদ করেছিলেন, তাতে কাদরী সাহেবরা তাঁকেও দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। সম্ভবত ইমরানের সমালোচনা শুনেই বুকে বল পেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা। তিন সদস্যের এক বিচারকমণ্ডলী প্রমাণের অভাবে আসিয়া বিবিকে মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু তারপর তাঁরা যে যাঁর মতো লুকিয়ে পড়েন। যে উকিল আসিয়ার পক্ষ নিয়ে আদালতে লড়াই করেছিলেন, তিনিও কোনো কথা না বলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরামর্শে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন নেদারল্যান্ডসে।

ততক্ষণে অবশ্য পাকিস্তানে ছোট-বড় নানা শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। লাঠিসোঁটা নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে হাজার হাজার মানুষ, অচল হয়ে পড়ে লাহোর, করাচি ও ইসলামাবাদের মতো প্রধান শহরগুলো। বিপদ সামলাতে সেনাবাহিনীকে নামাতে হয়, কিন্তু সেখানেও ভয়, সেনাবাহিনীর অনেকেই কাদরী সাহেবের মুরিদ।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, আসিয়াকে কিছুতেই দেশ ছেড়ে যেতে দেওয়া যাবে না, তাঁকে ফের আটক করতে হবে। বিপদ টের পেয়ে সেনাবাহিনী অবশ্য মুক্তির পরপরই গোপনে তাঁকে সেনাসদরে নিয়ে যায়। অনেকের ধারণা, তাঁকে সম্ভবত সেনা প্রহরায় ইতিমধ্যে অতি সতর্কতায় দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও মুখে বলা হচ্ছে আসিয়া দেশের ভেতরেই আছেন। এমন একটা কিছু হয়ে থাকতে পারে, এই সন্দেহে কাদরীর সমর্থকেরা সেনাবাহিনীর প্রধান কামার জাভেদ বাজওয়ার ফাঁসি দাবি করে বসেছেন। তাঁদের যুক্তি, কামার নিজেই বিধর্মী, তিনি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের। তিনি তো আসিয়ার পক্ষে থাকবেনই।

পাকিস্তানে সাধারণত যেমন হয়, এবারও ঘটনা সে দিকেই যাচ্ছে। মৌলবাদীরা যখন ফুঁসে ওঠে, তখন সে দেশের রাজনীতিকেরা নিজেদের সামলাতে বরাবরই আপসের পথ বেছে নেন। কেউ কেউ ভেবেছিলেন বিক্ষোভকারীদের প্রতি নতুন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যে রকম কঠোর সমালোচনা করেন, তাতে নিশ্চয় তিনি ধর্মীয় রাজনীতিকদের চাপের মুখে স্থির থাকবেন। তিনি নিজেও ধর্মকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ক্ষমতায় এসেছেন, সামরিক বাহিনীও তাঁর পক্ষে রয়েছে। কী বলব, তিন দিনের হরতালেই তাঁর সরকারের সেই কল্পিত দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে। রীতিমতো হাতে পায়ে ধরে ইমরানের সরকার আফজাল কাদরীর দলের সঙ্গে এক আপস চুক্তি করেছে। এতে বলা হয়েছে, আসিয়ার ব্লাসফেমি মামলা পুনরায় বিবেচনার জন্য আদালতে ফেরত পাঠানো হবে। আসিয়াকে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে না এমন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে এ রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। ১৯৪৯ সালে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি তুলে মাওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে সেখানে যে সহিংসতার সৃষ্টি হয়, তা সামলাতে লাহোরে সামরিক আইন জারি করতে হয়েছিল। সেই ধাক্কায় মৌলবাদীদের হাতে রাখতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে তথাকথিত 'অবজেকটিভ রেজল্যুশন' অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যেখানে অন্য যেকোনো নীতির ঊর্ধ্বে ধর্মকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। শাসনতন্ত্রের ধর্মীয়করণ দিয়ে শুরু, ৪৫ বছর পর সেই পাকিস্তান এখন আরও বেশি মাত্রায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দেশ, যেখানে সামান্য এক নিরক্ষর ও নিঃস্ব খ্রিষ্টান নারীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে সরকারকে আপস চুক্তি করতে হয় এক মৌলবাদী দলের সঙ্গে। এটা যে রাজনীতি, এর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সম্পর্ক নেই, এ কথা বুঝতে কাউকে রকেট বিজ্ঞানী হতে হয় না।

ঘটনা পাকিস্তানের, কিন্তু এর ঢেউ তার সীমান্তের বাইরে গিয়েও লাগবে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের নিজের দেশের রাজনীতিতেও দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে ধর্মের প্রবেশ ঘটছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের দেউলিয়াপনা থেকে আমরা যদি এখনো কিছু না শিখি, তাহলে আমাদের পরিণতি কী হতে পারে, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

১৪ নভেম্বর
দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর ৯৪)

'ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ' হিসেবে দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ (১২)

সাম্প্রতিক কালের বয়আত গ্রহণের ঈমাণ-বর্ধক ঘটনার কিছু দৃষ্টান্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা কর্তৃক প্রদত্ত জুমুয়ার খুতবায় বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। প্রত্যেকটি ঘটনা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতার বাস্তব অভিজ্ঞতা-মূলক অকাট্য প্রমাণ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

*** সত্য স্বপ্ন এবং ঐশী সাহায্যে একটি মুসলমান ফিরকার ইমাম এবং ৪০টিরও বেশী গ্রামের মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণ:**

"পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ মালির একটি এলাকার নাম বালা। এতে তেজানিয়া নামক ফিরকার একজন ইমাম সাহেব রয়েছেন। তার বাবার মাধ্যমেই সেই এলাকার ৯৩টি গ্রামের মানুষ মুসলমান হয়। আর আল্লাহতা'লার ফজলে কিছুদিন পূর্বে তিনি আহমদীয়াত কবুল করার তৌফিক লাভ করেন। আদম সাহেব বর্ণনা করেন যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার ঘরে আসলেন। তিনি হুযুরের সাথে ঘরেই ছিলেন আর বাহিরে অনেক উলামা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমি হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করলাম যে, বাহিরে আলেমগণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। হুযুর বাহিরে আসলেন আর সমস্ত অ-আহমদী আলেমদের মাথা থেকে টুপি খুলে দিলেন, আর শুধুমাত্র আমার মাথাতেই টুপি থাকতে দিলেন। আহমদীয়াত কবুল করার পর তিনি আমাদেও মোয়াল্লেমগণের সাথে তার মুরীদদের গ্রামে যেতে থাকেন। আর আল্লাহতা'লার ফজলে এখ নপর্যন্ত ৪০টিরও বেশী গ্রামের মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে।"

*** কঠোর বিরোধিতার পর আহমদীয়া রেডিও ষ্টেশনের সংগে যোগাযোগের পর প্রকাশিত সত্যের আলোকে আহমদীয়াত গ্রহণ...।**

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি থেকে মুয়াল্লেম আবদুল্লাহ সাহেব লিখেন– বামাকো এর একজন শিক্ষক হলেন দাম্বেলে সাহেব। তিনি আহমদীয়াতের শক্ত বিরোধী ছিলেন। যখনই তিনি আহমদীয়া রেডিওতে টেলিফোন করতেন, তখনই জামাতকে গালি দেওয়া শুরু করতেন। আর যদি তাকে টেলিফোন করা হতো তাহলেও তিনি জামা'তকে গালি দিতেন। এমন করতে করতে অনেক দিন হয়ে গেল। একদিন কাঁদতে কাঁদতে আহমদীয়া রেডিও যার নাম "রাবওয়া এফ এম" সেখানে টেলিফোন করেন এবং বলেন, তিনি একরাত পূর্বে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন এবং যে নূর তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাঝে দেখেছেন, তা এর পূর্বে কখনও দেখেননি। তাই এখন তিনি জামাতের কাছে আন্তরিক হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করছেন এবং এই ভয় করছেন যে, যদি আহমদীরা তাকে আহমদীয়া বিরোধী কথা-বার্তার জন্য ক্ষমা না করে তাহলে খোদাতা'লাও তাকে ক্ষমা করবেন না। এর ফলে মোয়াল্লেম সাহেব তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বলেন, সত্য যেহেতু প্রকাশিত হয়ে গেছে, তাই বয়াত করে নিন। অতএব তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হন।"

*** অনেকগুলো ফিরকার মধ্যে কোনটি**

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা আন্তরিক দোয়ার ফলে এবং সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরে বয়আত গ্রহণঃ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির রিজিওন কোলিকোরো থেকে মুয়াল্লেম ইউসুফ সাহেব বলেন– আমাদের একটি গ্রাম "জালাক্রোজি" এর একজন বুযুর্গ জন্মগত মুসলমান ছিলেন। কিন্তু মুসলমান ফিরকাগুলোর পরস্পর মত বিরোধিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি নির্ধারণ করতে পারতেন না যে কোন ফিরকা খোদাতা'লার পক্ষ থেকে। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকেন, কিন্তু কোথাও সত্যের সন্ধান পাননি। একদিন যখন তিনি আহমদীয়া 'রেডিও রাবওয়া' শুনছিলেন তখন সেখানে তিনি শুনতে পেলেন, মোয়াল্লেম সাহেব নিজ বক্তৃতায় বর্ণনা করেন যে, যদি কেউ সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায় তবে সে যেন খোদা তা'লার কাছে দোয়া করে, খোদা তা'লা নিজেই তাকে পথ প্রদর্শন করবেন। এই পদ্ধতি তার খুব পছন্দ হলো এবং তিনি নিয়্যত করেন যে, যতক্ষণ খোদাতা'লা তাকে পথ প্রদর্শন না করবেন, ততক্ষণ তিনি খোদা'তালার কাছে দোয়া করতে থাকবেন। অতএব কিছুদিন চিল্লা করার পরই একদিন খোদাতা'লা তাকে স্বপ্নে দেখালেন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তার ঘরে অবতরণ করেছেন এবং স্নেহের সাথে তার ছেলের মাথায় হাত রেখেছেন। এই স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে তার চোখ খুলে গেল। এই স্বপ্নের পরপরই তিনি মালির সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে হযরত ইমাম মাহদীর ছবি দেখে বলেন যে, ইনিই হযরত ইমাম মাহদী (আ.), যিনি তার ঘরে আগমন করেছিলেন। এরপর তিনি বয়াত করেন।

*** পবিত্র কুরআনের তফসীর পড়ে মুগ্ধ হয়ে বয়আত গ্রহণ...।**

"ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, একজন নতুন বয়আতকারী বন্ধুর নাম হলো, কামাল সাহেব। তিনি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে আমি প্রথাগত মুসলমান হিসেবেই ছিলাম। আলেমদের পক্ষ থেকে কুরআনের যে সমস্ত ব্যাখ্যা করা হয় তাতে আমার মনে শান্তি ছিল না। আমি দুই চরম পরিস্থিতির মাঝে জীবন যাপন করছিলাম। একদিকে সেটি যার ওপর আমার ঈমান ছিল, অপরদিকে আমার মন–মস্তিষ্ক কিছু কথাকে প্রতাখ্যান করছিল আর দলীল ও যুক্তির সন্ধানে ছিল। আমি একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জীবন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে আমার অন্ধকার জীবনে এক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় যা আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পানে নতুন পথ দেখায়। একদিন আমি আমার বোনের স্বামীর সাথে কোন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি জামাতে আহমদীয়ার কথা উল্লেখ করেন আর আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীর পড়তে বলেন। পবিত্র কুরআনের সেই তফসীর পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। এত সহজ-সরল এবং সাবলীল তফসীর চৌদ্দশ বছরে অন্য কেউ কেন লেখেনি? এরপর আমার বোনের স্বামী আমাকে এমটিএ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ইন্টারনেটের ঠিকানা দেন। আমি এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনেক বই পড়েছি এবং আহমদীয়া জামাতের বেশ কিছু অনুষ্ঠানও দেখেছি। আমি সেখানে মানুষকে নিষ্ঠাবান পেয়েছি এবং যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ কথা বলতে দেখেছি। আমার এমন মনে হলো যেন আমার হাতে বিরাট ধন-ভান্ডার এসে গেছে, আমার আত্মা স্বাধীনতা লাভ করেছে। এরপর আমার সকল কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায় এবং প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে আমি অবগত হই। এরপর তিনি বয়আত করেন।"

*** খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা এবং ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর একজন খৃষ্টান পাদ্রীসহ ৯১ জনের বয়আত গ্রহণ...।**

"দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গুয়েতামালার মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, লিফলেট বিতরণের ফলে ৯১ ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণকারীদের মাঝে একজন হলেন, পাদ্রী যিনি ৩৩ বছর পর্যন্ত একটি ক্যাথলিক চার্চ এবং ৫ বছর প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আরেকজন পৌরসভায় জজ তার নাম হলো, ডমিংগো সাহেব। জামেয়া আহমদীয়া কানাডা থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে এক মাসের জন্য সেখানে পাঠানো হয়। তারা গুয়েতামালায় প্রায় লক্ষাধিক লিফলেট বা ফোল্ডার বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছেন। এই বিচারক সাহেবও একটি ফোল্ডার পান এবং মিশন হাউসে আসেন। সেখানে মুবাল্লিগ ইনচার্জের সাথে দু-তিন ঘন্টা ইসলাম সম্পর্কে তার আলোচনা হয়। তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তার ওপর এর ভাল প্রভাব পড়ে। তিনি দু-তিন শত ফোল্ডার সাথে করে নিয়ে যান এবং বলেন, আমি নিজ অঞ্চলে এগুলো বিতরণ করবো।

কিছুদিন পর তিনি নিজ এলাকা থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আসেন এবং দশ দিন আমাদের মিশন হাউসে অবস্থান করেন। এই সময় ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্মের মাঝে তুলনা, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। একই সাথে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত করে জামাতে আহমদীয়ার পরিচিতি তাদের কাছে তুলে ধরা হয়। আল্লাহতা'লার ফযলে ডমিংগো সাহেব এবং তার স্ত্রী বয়আত ফরম পূরণ করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, আর নিজ অঞ্চলে গিয়ে আহমদীয়াতের প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি নিজ অঞ্চলে তবলিগী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমি সেখানে গিয়ে দেখি, স্কুলের হলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশেপাশের গ্রামের লোকজনদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করা হয় এবং আহমদীয়াতের তবলীগ বা প্রচার করা হয়। গুয়েতামালার আহমদীরা তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাবলি শোনান। প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠান সাত ঘন্টা স্থায়ী হয়।

অধিবেশনের শেষ হওয়ার পূর্বে উপস্থিত সবাই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন যাদের সংখ্যা ছিল ৮৯। নর-নারী সবাই এতে অন্তর্ভূক্ত।"

*** মূর্তি-পূজা ত্যাগ করে ঐশী সাহায্যের ভিত্তিতে স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ পেয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ... আল্লাহ্ তা'লা তাকে সত্য চেনার তৌফিক দিয়েছেন।**

"পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি রিজিওন কোলিকোরো থেকে সেখানকার মুবাল্লেগ ফাতেহ সাহেব লিখেন– আমার রিজিওন কোলিকোরো থেকে সাঈদ কোলিবালি সাহেব নামের এক বুযুর্গ আমাদের রেডিও 'আলনূর' এ আসেন এবং তিনি বলেন, তার পূর্বপুরুষগণ মূর্তি-পূজারী ছিল এবং তার দ্বারাও মূর্তি-পূজা করাতে চাইতো। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই মূর্তি-পূজাকে তার প্রকৃতি অপছন্দ করত। যখন তিনি কিছুটা বড় হলেন, তখন তিনি মূর্তি-পূজাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। যার ফলে তার বাবা-মা এবং অন্য সকল আত্মীয় স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি এই বিরোধিতার কোন পরোয়া করেননি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি হযরত ঈমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি বলেন, এই অপেক্ষার দীর্ঘ যুগ পরে একদিন স্বপ্নে দেখি যে, এক ফর্সা রঙ্গের বুযুর্গ মালি থেকে উত্তর দিকে অবতরণ করেছেন এবং সেই বুযুর্গকে দেখার জন্য অনেক লোক জমা হয়েগেছে। হুযুর (আ.) সেই বুযুর্গের এর এত নূর ভরা চেহারা তিনি এর আগে দেখেননি। তাই তিনি স্বপ্নের অবস্থায় অজান্তেই নিজেকে প্রশ্ন করেন, এই বুযুর্গ কে? তখন তার পিছনে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি বললো, ইনি হলেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)। তার এই দৃশ্য দেখার পরপরই চোখ খুলে গেল।

এরপর থেকে তার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন। কিন্তু তিনি যখন মুসলমান ফির্কাগুলোর দিকে তাকান তখন দেখেন যে, তাদের কেউই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সংবাদ দেয় না। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি আহমদীয়া রেডিও আলনূর 'অন' করেন যাতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সংবাদ বর্ণনা করা হয়। এই সংবাদ শুনার সাথে সাথে তার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্বপ্নের কিছুকাল পর তিনি আহমদীয়া মিশন হাউসে এসে নিজ পরিবারের সকলকে নিয়ে বয়আত করেন। আর যখন তাকে এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো হলো তখন সেই ছবি দেখার সাথে সাথে তিনি বলেন যে, এই সেই হযরত ইমাম মাহদী, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর তিনি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা হিসেবে আদায় করেন এবং বলেন এখন তিনি খোদাতা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন যে তিনি তাকে সত্য চেনার তৌফিক দিয়েছেন।

*** "আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি আহমদীরাই সত্যিকার মুসলমান...।"**

ভারত থেকে আমাদের কুরুব্বী আজমল সাহেব লেখেন, এ বছর ১৭ই জুন ২০১৫ অর্থাৎ যখন এ পত্র লিখেছেন তখনকার কথা, পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে একটি তবলীগি অধিবেশন ডাকা হয়। মিটিংয়ে গ্রামের অ-আহমদী মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধায়ক, মসজিদের মুয়াযযিন এবং আরো কয়েকজন শিক্ষিত অ-আহমদী যোগ দেয়। মিটিং শেষে মসজিদ কমিটির নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ক বলেন, আমার ভাতিজা আহমদী আর আমি আহমদীদের সব সময় ঘৃণাই করতাম এবং মনে করতাম, আহমদীরা বে-দ্বীন। কিন্তু এখন আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, আহমদীরাই সত্যিকার মুসলমান আর বাকী সবাই ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে। এরপর এই গ্রামে ১২টি বয়আতও হয়।' [আহমদীয়া জামাতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত ২৮/০৩/২০১৪ এবং ২১/০৯/২০১৫ খুতবা অবলম্বণে সংকলিত 'পাক্ষিক আহমদী' ৩১/০৭/২০১৪ এবং ৩০/১১/২০১৫]।

(চলবে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানীত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বেদ ও বেদের দেবতাদের সম্পর্কে কিছু কথা

খন্দকার আজমল হক

(১ম কিস্তি)

বেদ হিন্দুদের আদি ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুদের হিন্দু বলা হলেও তাদের ধর্মের প্রকৃত নাম বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। হিন্দুদের মতে বেদ সনাতন, নিত্ত; এজন্য তাদের ধর্মের নাম বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। (গীতা- শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণিত- ভূমিকা, পৃষ্ঠা- ৩)

হিন্দুদের পূর্ব পুরুষ আর্যগণ মধ্য এশিয়া মতান্তরে দক্ষিণ রাশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের তীর হতে এসে সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের পাঞ্জাব এলাকায় বসতি স্থাপন করে। পরে তারা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধু অববাহিকায় বাস করত বলে তাদের হিন্দু বলা হত। কালক্রমে হিন্দুদের ধর্ম বলে তাদের ধর্ম হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে কেউ আর তাদেরকে বৈদিক বা সনাতন ধর্মাবলম্বি বলে ডাকে না।

বেদ অনেক পুরাতন ধর্মগ্রন্থ। ঋগবেদের ১ম খন্ডের "ঋগবেদ পরিচয়ের" লেখক কয়েকজন মনীষীর মতামতের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন যে মূল বেদের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর। (ঋগবেদ ১ম খন্ড ঋগবেদ পরিচয়, পৃ: ৩৩) তখন লিখন পদ্ধতি আবিস্কার না হওয়ায় স্মরণ শক্তির মাধ্যমে তা অধিগত হয়। তিনি এও বলেন যে এত বড় গ্রন্থ স্মরণ শক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিন চালু থাকা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি মনে করেন, যেকোন ভাবে এটা হয়তো তৎকালে সংরক্ষিত ছিল। কিভাবে সংরক্ষিত ছিল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি কিছু বিভ্রান্তিমূলক কথা বলেছেন। তিনি একবার বলেছেন, "প্রস্তর খোদিত হয়েছিল বলেই অশোকের লিখন সংরক্ষিত হয়েছে। তার পূর্বে খোদিত হবার উপলক্ষ ঘটেনি বলেই সম্ভবত পূর্ববর্তী কালের লিপি সংরক্ষিত হয়নি"। আবার বলেছেন, "নির্ভূল ভাবে এই বিরাট গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে বলেই এরূপ অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত যে নিশ্চয় কোন লিপি ছিল যার সাহায্যে ঋগ বেদের আদিরূপ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছিল।" (ঋগবেদ - ১ম খন্ড ঋগবেদ পরিচয় পৃ: ৫৩) এটা তাঁর অনুমান মাত্র। তাঁর অনুমান যে সঠিক নয় তা তাঁর পরবর্তী কথাতেই প্রতীয়মান হয়।

আমরা জেনেছি যে আদি বেদের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর। আর আর্যরা ভারতে আসে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ শতাব্দির পরবর্তী শতাব্দি সমূহের কোন এক সময়। (ঋগবেদ ১ম খন্ড ঋগবেদ পরিচয় - পৃ: ৪৫)

সে সময় সিন্ধু অববাহিকায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নামে দু'টি সুসভ্য জাতি বাস করত। এরা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ বৎসরকালে উত্তর পশ্চিম ভারতের সিন্ধু ও পাঞ্জাব এলাকায় রাজত্ব করত। আর্যগণ এই হরপ্পাদের পরাজিত করে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এতে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে আর্যগণ খৃষ্ট পূর্ব ২৫০০ বৎসরের সমসাময়িক কালে ভারতে আসে। (ঋগবেদ ১ম খন্ড ঋগবেদ পরিচয়, পৃ: ৪২-৪৫)

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পারা উন্নত ধরণের সংস্কৃতির ধারক বাহক ছিল। "ঋগবেদ পরিচয়ের" লেখকের বিবরণ হতে জানা যায় যে হরপ্পাদের নিজস্ব লিপিমালা ছিল। কিন্তু আর্যদের ভারতে আসার সময় তাদের কোন লিপিমালা ছিল না। আর্যগণ তৎকালীন ভারতীয়দের কাছ হতেই লিপি মালার প্রয়োগ পদ্ধতি শেখে। লেখক বলেন, "সুতরাং এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, পূর্বে আর্যদের নিজস্ব লিপিমালা না থাকলেও এই সংস্কৃতির (ভারতীয় সংস্কৃতি- লেখক) কাছ থেকে লিপি প্রয়োগের রীতি তারা গ্রহণ করতে পারে।" (ঋগবেদ ১ম - ঋগবেদ পরিচয়, পৃ: ৫৩)

অতএব বোঝা যায় যে, আর্যরা ভারতে আসার পর, অর্থাৎ প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ বৎসরের পর লিপিমালার প্রয়োগ শেখে। তাহলে কিভাবে খ্রিষ্ট্রপূর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বের রচিত বেদ লিপি লেখনের মাধ্যমে নির্ভূল ও আদিরূপে সংরক্ষিত ছিল? তখনতো আর্যরা বেদ সংরক্ষণের কোন পদ্ধতিই জানতো না।

তাছাড়া আদি বেদ শিলালিপির মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকলে নূতনভাবে আর বেদ লেখার প্রয়োজন হতো না। কেননা পরবর্তীতে রচিত বেদও তো শিলালিপির মাধ্যমেই সংরক্ষিত থাকার কথা। কারণ তখনও কাগজ কলমরূপ লিখন সামগ্রী আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু তখন আর্যগণ শিলালিপির মাধ্যমে লিখন সংরক্ষণ পদ্ধতি শিখেছিল। পরবর্তীতে রচিত বেদ যদি আদি বেদ হয় তবে একই বেদ সেই শিলালিপির মাধ্যমে দ্বিতীয়বার লেখার কোন যৌক্তিকতা ছিলনা।

এখন বর্তমান বেদের রচনাকাল সম্পর্কে জানা যাক।

বর্তমান বেদের রচনাকাল সম্পর্কে ঋগবেদের ১ম খন্ডের "ঋগবেদ পরিচয়ের" লেখক বিভিন্ন জনের মতামত তুলে ধরে সর্বশেষ মত প্রকাশ করে বলেন যে, বর্তমান বেদের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দি। (ঋগবেদ, ১ম খন্ড- ঋগবেদ পরিচয়, পৃ: ৪৬)

"ঋগবেদ পরিচয়ের" লেখক ঋগবেদ পরিচয়ের ৫৩ পৃষ্ঠাতে বলতে চেয়েছেন যে, বেদে বেদ পাঠ করার কথা বলায় প্রতীয়মান হয় যে, আদি বেদ সংরক্ষিত ছিল বলেই সেই বেদ পাঠের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উপরে আলোচিত হয়েছে যে আদি বেদ রচনাকালে শিলালিপির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে সংরক্ষণের কোন পদ্ধতি আর্যদের জানা ছিল না। সেজন্য আদিবেদ সংরক্ষিত থাকার কথা নয়। তাই সে বেদ পাঠের প্রশ্নই আসে না। আর যেহেতু পরবর্তীতে রচিত বেদে বেদ পাঠের কথা বলা হয়েছে, (ঋগবেদ ১ম খন্ড ১ম মন্ডলের ৩৮ সুক্তের ১৪ ঋক) সুতরাং সেই বেদ পাঠের কথাই বলা হয়ে থাকবে, অন্য কোন বেদ নয়।

পরবর্তীতে রচিত অর্থাৎ বর্তমান বেদ যে আদি বেদ নয় তার আর একটি প্রমাণ এই যে, যেসব ঋষি বেদের ঋক বর্ণনা করেন তারা মহাভারত বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক, খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসরের নয়। যেমন বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র। বশিষ্ট সুহাস রাজার এবং বিশ্বামিত্র ভারতদের পুরোহিত ছিলেন। সুহাস ও ভারতগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (ঋগবেদ ১ম খন্ড, ১ম মন্ডলের ৪৭ সুক্তের ৬নং ঋকের টীকা, ৩য় মন্ডলের ৩৩ সুক্তের ১ম ও ১১তম ঋকের টীকা)

বর্তমান বেদ যে নূতনভাবে বর্ণিত, গীতার লেখক শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষও তা স্বীকার করেছেন। তিনি গীতার ভূমিকার একস্থানে বলেছেন "অতিপ্রাচীনকালে বেদের গুঢ়ার্থ গুরু শিষ্যের পরম্পরায় অধিগত হইত। উহা লিপিবদ্ধ হইত না। উহা পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে বেদার্থ যিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদানুযায়ী নানা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে।" (গীতা- ২য় অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যার রহস্য - গীতা ও বেদের অংশ - সংখ্যাযোগ)

অতএব এটাই সঠিক যে বর্তমান বেদ পরবর্তীতে তৎকালীন ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা রচিত, যা তাঁরা নিজেরাই ইচ্ছামাফিক লিখেছেন যার জন্য বেদের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় বেদব্যাস (ব্যাস মুনি), যিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, বেদকে চার খন্ডে বিভক্ত করেন। (ঋগবেদ ১ম খন্ড ঋগবেদ পরিচয়, পৃ: ৩৩)

বেদ চার খন্ড হওয়ায় একে চতুর্বেদ বলা হয়। এই চারটি বেদের নাম ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। প্রথম তিনটি বেদ আগে রচিত হয়। এজন্য এদের ত্রয়ী বেদ বলে। ঋগবেদ প্রথম রচিত হয় এবং অথর্ব বেদ সর্বশেষে। (ঋগবেদ ১ম খন্ড, ঋগবেদ পরিচয়, পৃ: ৩২)

সম্ভবত অনুবাদকালে ঋগবেদ দু'খন্ডে অনুদিত হয়। এজন্য বর্তমান অনুবাদকৃত বেদ পাঁচ খন্ডে বিভক্ত।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বর্তমান বেদ বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা বর্ণিত হওয়া মূল বেদের আদি রূপ না থাকার আর একটি কারণ। তারা ঈশ্বর সম্পর্কে সামান্য কিছু বর্ণনা করলেও প্রায় সমস্ত ঋকেই দেবতাদের স্তবস্তুতির বিবৃতি দিয়েছেন। মূল বেদ ঐশ্বরিক হবার কথা, যেখানে ঈশ্বর বা তাঁর অবতারদের বর্ণিত কথা থাকবে। কেননা ঈশ্বরের বাণী থাকার জন্যই মূল ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বা তাঁর অবতারদের কোন বাণী বর্তমান বেদে নেই। ঋষিগণও বেদের কোথাও বলেননি যে ঈশ্বরের নির্দেশে তারা এসব বিবৃতি দিয়েছেন। ঋষিগণ বর্তমান বেদে যেসব দেব দেবীর স্তবস্তুতি করেছেন তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট। (কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৩য় কান্ডের ৪৮৬ পৃষ্ঠার মন্ত্রের অনুবাদের ১ম ঋক) এদেরকেই উপাস্য বানিয়ে তাদেরকে দেবতারূপে উপাসনা করার কথা বেদে বর্ণিত হয়েছে। (ঋগবেদ ১ম খন্ড, ১ম মন্ডলের ২৪ সুক্তের ১৪ ঋকের টীকা-৪) কিন্তু মূলবেদ ঐশ্বরিক হওয়ায় তাতে দেব দেবীর উপাসনার কথা থাকতে পারেনা, কারণ ঈশ্বরকে চেনা জানা ও তাঁর আরাধনাই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য, মানুষের কল্পিত কোন দেবতার স্তবস্তুতি নয়। আর এসব বিষয় ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থ থেকেই জানা যায়। অন্যান্য ধর্মের ধর্ম পুস্তক এর প্রমাণ। বর্তমান বেদ যেহেতু ঈশ্বর প্রদত্ত নয় বা তাতে ঈশ্বর বা তাঁর অবতারদের বাণী নেই, তাই এটা মূল বেদ নয়।

এছাড়া বর্তমান বেদের বর্ণনায় বেশ কিছু গড়মিল দেখা যায়। যেমন কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে অগ্নি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঋগবেদ ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ মন্ডল ১ম সুক্ত ১ম ঋক)। কোন স্থানে বলা হয়েছে ব্রহ্মা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৩য় কান্ড, ৪র্থ প্রপাঠক ৫০৩ পৃষ্ঠার মন্ত্রের অনুবাদের ৬ষ্ঠ ঋক) কোন স্থানে বলা হয়েছে, ইন্দ্র সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঋগবেদ ২য় খন্ড, ১০ম মন্ডল ৮৬ সুক্ত, ঋক ২, ৪)

এরূপ একস্থানে বলা হয়েছে উষা সূর্যের স্ত্রী (ঋগবেদ - ১ম খন্ড, ১ম মন্ডল ৯২ সুক্ত ১১ ঋক)। আবার কোনস্থানে বলা হয়েছে উষা সূর্যের মাতা। (ঋগবেদ প্রথম খন্ড, ১ম মন্ডল ১১১ সুক্ত ২ ঋক) অন্য একস্থানে সূর্যকে ইন্দ্র বলা হয়েছে (ঋগবেদ ১ম খন্ড, ১ম মন্ডল ৬ সুক্ত ১, ২ ঋক) আবার কোনস্থানে বলা হয়েছে ইন্দ্র ও সূর্য দু'টি পৃথক সত্তা (ঋগবেদ প্রথম খন্ড, ৪থ মন্ডল, ৫৮ সুক্ত, ৪থ ঋক)। বেদের একস্থানে ইন্দ্রকে অমর বলা হয়েছে (ঋগবেদ - ১ম খন্ড, ১ম মন্ডল ৮৩ সুক্ত ৫ম ঋক) অপর স্থানে তাকে দীর্ঘায়ু বলা হয়েছে। (ঋগবেদ ২য়, ১ম মন্ডল ৭০ সুক্ত ৭ম ঋক)

এ ধরনের গড়মিল বেদের অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। কোন ধর্মগ্রন্থে এরূপ গড়মিল থাকতে পারে না। বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা রচিত জন্য এরূপ গড়মিলের সৃষ্টি হয়েছে। একেক ঋষি একেক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে সমন্বয়তার অভাব ছিল।

মূল বেদের আদিরূপ সংরক্ষিত না থাকার আর একটি বড় প্রমাণ, বর্তমান বেদের কয়েক ঋকের কিছু বিষয় অশ্রাব্য, অকথ্য ও নোংরা ভাষায় বর্ণিত। এরূপ ভাষা কোন প্রকৃত সাহিত্য পুস্তকেও থাকেনা, ধর্মগ্রন্থতো দূরের কথা। এসব সুক্তিতে

অসঙ্গত ভাষা ব্যবহারের যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো কিছু রোগ মুক্তির মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। (ঋগবেদ ২য় খন্ড, ১০ম মন্ডল, ১০ম সুক্ত, ঋক- ২-৩, ৭; ঐ ১০ম মন্ডল, ৮৬ সুক্ত, ১৬, ১৭ ঋক; ঐ ১০ম মন্ডল ১৬২ সুক্ত ৩-৪ ঋক) এরূপ ভাষা মন্ত্রে ব্যবহারও অসঙ্গত।

মন্ত্র হোক বা না হোক কোন ধর্ম গ্রন্থের ভাষা এটা নয়। মূল বা আদি বেদ সম্পর্কে গীতায় যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, তা ঐশ্বরিক ছিল। শ্রী কৃষ্ণ গীতায় বর্তমান বেদের সমালোচনা করেছেন। (গীতা- ২:৪২-৪৬) কিন্তু আদি বেদ সম্পর্কে অন্য কথা বলা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে বেদের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর জানেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে মূল শ্লোকটি এখানে তুলে ধরা হল।

শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, "আমি অন্তর্যামি রূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি। আমা হইতেই প্রাণীগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপও সাধিত হয়। আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য। আমি আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই।" (গীতা ১৫:১৫ পৃ: ৩৮৬)

শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, "আমি অন্তর্যামি"। এখানে 'আমি' অর্থ ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ নন। কেননা তিনি অবতার হলেও পিতৃ ঔরসে ও মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করায় তিনি মানুষ। ঈশ্বর না জানালে তিনি কোন কিছু জানতে পারেন না। তাই তিনি অন্তর্যামি হতে পারেন না। আবার বলা হয়েছে, 'আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি'। মানুষ কখনো সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় ঈশ্বরই যে অন্তর্যামি তা অর্জুনকে বলেছিলেন এবং তাঁরই স্মরণ নিতে বলেছেন। (গীতা- ১৮:৬১-৬৩)

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআনেও এরূপ কথা আছে। কুরআনের একস্থানে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা তাকে যা কিছু প্ররোচনা দেয় তাও আমরা অবগত আছি এবং আমরা (তার) জীবন শিরা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটে আছি"। (৫০:১৭) এখানে আল্লাহ বা ঈশ্বর যে অন্তর্যামি সে কথাই বর্ণিত হয়েছে। গীতার কথা এ কথারই প্রতিধ্বনী।

অতএব গীতায় ১৫:১৫ শ্লোকের কথা যে ঈশ্বরের তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমান বেদে ঋষিদের বর্ণিত দেব-দেবীর স্তবস্তুতি, উপাসনার প্রতিবাদে গীতার ১৫:১৫ শ্লোকে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলিয়েছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে বেদ নবরূপে রচিত হয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে। সেজন্য বেদ সম্পর্কে গীতার এই বর্ণনা অস্বাভাবিক নয়।

(চলবে)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

রংপুর জামাতের মসজিদে তরবিয়তি সভা

গত ১০ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে রংপুর জামাতের মুন্সিপাড়া মসজিদে বেলা সাড়ে তিনটায় জোহর ও আছরের নামায একত্রে জমা করে পড়ার পরে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত রংপুরের সদস্য/সদস্যাদেরকে নিয়ে এক গুরুত্ব পূর্ণ তরবিয়তী সভা অত্যান্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। সভায় কেন্দ্র থেকে আরো যোগদান করেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোহতরম মুহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ সেক্রেটারী জায়দাদ ও মোহতরম ইমতিয়াজ আলী সেক্রেটারী তবলীগ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মেহেদি হাসান মূসা। সুচনায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মোহতরম মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব সহ অন্য দুজন সেক্রেটারী সাহেবানের রংপুরে শুভাগমন উপলক্ষে ধন্যবাদ জানিয়ে খাকসার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করি। এরপরে মোহতরম মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব সকল লাজনা নাসেরাত আনসার খোদ্দাম ও আতফালের সাথে পরিচিত হন। পরিচিত হওয়ার সময় তিনি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেককে জামাতি কাজের দিক নির্দেশনা দান করেন। এরপরে তিনি এতায়াতে নেজামে জামাতের গুরুত্ব, পরিবারের সবাইকে নিয়ে মসজিদে অথবা সম্ভব না হলে নামাজ সেন্টার বা গৃহে বাজামাত নামাজ কায়েম করার ফজিলত এবং মহান আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী তথা নিয়মিত ভাবে চাঁদা আদায়ের তাৎপর্য অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন।

পরিশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। উপরোক্ত বিষয়ে দিক নির্দেশনা ছাড়াও হুযূর (আই.)এর খোতবা নিয়মিত ভাবে শ্রবণ এবং সেই অনুযায়ী চলার আহবান জানান তিনি। সবশেষে সবাইকে নিয়ে তিনি দোয়া পরিচালনা করেন। রাত সাতটা পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানে লাজনা নাসেরাত সহ উপস্থিতি ছিল প্রায় ৭০ জন।

মাহবুব উল ইসলাম
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুর

উথলী মজলিসে লাজনা ইমাইল্লাহ্ এর উদ্যোগে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১০/১১/২০১৮ তারিখ বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত আড়াই ঘন্টাব্যাপী জেরে তবলীগ মেহমানদেরকে নিয়ে তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠান সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিসেস সেলিনা আক্তার। তারপর দোয়া পরিচালনা করেন উথলী জামাতে কর্মরত জনাব মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম মুরুব্বী সিলসিলাহ। বাংলা নযম পাঠ করেন একজন নাসেরাত তাহিরা রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা সালমা জুয়েল প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, উথলী। জনাব মহিউদ্দিন রিপন প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলী এবং অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিলেন জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন, সেক্রেটারী তবলীগ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলী ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর আমেলার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। তারপর ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমন ও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে অকাট্য দলিল সাপেক্ষে বিস্তারিত জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সংখ্যা মেহমান ৪৫ জন ও লাজনা নাসেরাত অন্যান্য ১৮ জন সহ। সর্বমোট ৬৩ জন। সবশেষে দোয়া ও মেহমানদের আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মোছাঃ সাফিয়া খাতুন
সেক্রেটারী তবলীগ
লাজনা ইমাইল্লাহ, উথলী

নও মোবাঈন সদস্যদের সমন্বয়ে একদিনের তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৩/১১/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত নও মোবাঈনদের নিয়ে একদিনের তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মোট ১৯ জন নও মোবাঈন উপস্থিত ছিলেন। তিনজন জেরে তবলীগসহ অন্যান্য ৭ জন মিলে মোট উপস্থিতি ৩০ জন ছিল। এতে সভাপতিত্ব করেন নও মোবাঈন সেক্রেটারী সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম

পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপরে একজন নও মোবাইন সদস্য নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেন। মোয়াল্লেম আমীর হোসেন সাহেব আহমদীয়াত কি? বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের প্রসার, খেলাফত, এতায়াতে নেযাম ও সাংগঠনিক বিষয় সহজ ভাষায় বর্ণনা করেন। এরপর মুরব্বী সারফ আহমদ বয়াতের তাৎপর্য ও বায়তুল মাল (চাঁদা প্রদান ব্যবস্থাপনা) তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল বারী মোড়ল
নও মোবাঈন সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরগাং

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের পাথরঘাটা হালকা প্রেসিডেন্ট ও মজলিস আনসারুল্লাহ্, পাথরঘাটার যয়ীমে আলা জনাব মোহাম্মদ শেখ আলী হোসেন সাহেব গত ২১/১১/২০১৮ ইং তারিখে রোজ বুধবার রাত ১০.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি অত্যন্ত তবলীগ পাগল ব্যক্তি ছিলেন এবং নিবেদিত আহমদী ছিলেন। নন-আহমদী ভাইদের মধ্যে অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালে শহীদ সুবহান মোড়লের তবলীগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং পাথারঘাটা খেলারডাঙ্গা, কেরালকাতা, বলিয়ানপুর জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে বিবিসহ ৩ ছেলে ১ মেয়ে ও নাতি নাতনি রেখে যান। তার মৃত্যুতে সুন্দরবন জামাতের সকলেই মর্মাহত হন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তার আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং তার পরিবার পরিজনকে তার বিয়োগ ব্যথা সংবরণ করার তৌফিক দান করেন সেজন্য জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট একান্ত দোয়ার আরজ করছি।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (বুলু)

শুভ বিবাহ

* ১২/১০/২০১৮ তারিখ মোছাঃ শিমুল পারভীন, পিতা- মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মিরগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে সেলিম রেজা, পিতা- আবু শহিদ গাজী, বড়ভেটখালী, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩২।

* ১০/০৯/২০১৮ তারিখ মোছাঃ সিনথিয়া পারভীন, পিতা- বাবলুর রহমান ফকির, বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ মাকফুর আলম, পিতা- মোহাম্মদ নজরুল গাজী, মীরগাং-যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৩।

* ১৪/১০/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ সোনিয়া আক্তার (কল্পনা), পিতা- মোহাম্মদ শাহজাহান আলী, গ্রাম-আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ রনি আহমদ নাইয়ুব, পিতা- মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, গ্রাম ফুলতলা, পোঃ ফুলতলা, থানা- বোদা, জেলা পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৪।

* ১৪/০৯/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ সাদিয়া সুলতানা (তুশি), পিতা- মোহাম্মদ লোকমান, ডি-৬৮/৪, তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩৪০-এর সাথে জনাব ফরহাদ আহমদ, পিতা- শহীদ মিয়া, গ্রাম+পোঃ তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এর বিবাহ ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৫।

* ০৯/১১/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ ফাতেমা আক্তার মিতু, পিতামৃত-আনোয়ার হোসেন, উলানিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল-এর সাথে এস, এম, আবু তাহের সোহাগ, পিতামৃত-এস, এম, আবু সাঈদ শনির আখরা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৬।

* ০২/১১/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ পুষ্প হাজারীকা, পিতা- মোহাম্মদ জাকির হোসেন হাজারী, গ্রাম+পোঃ ঘাটুরা, থানা-জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে বশির আহমদ, পিতা- আলীম উদ্দিন, 233/4, J.N Shah Road-এর বিবাহ ২,০০,১০০/- (দুই লক্ষ একশত) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৭।

* ২১/১০/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ ফারিয়া তাবাসসুম, পিতা- ফারুক আহমদ, ১১২/১, উত্তর সিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, পিতা- দেলোয়ার হোসেন হাওলাদার, গন্ডামারা, চাঁদপুর-এর বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৮।

* ০৬/১০/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ দুররে সামীন ইনু, পিতা- মোবারক আলী আফ্রাদ, গ্রাম- আগমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে সৈয়দ নাঈম উদ্দীন হাফিজ, পিতা- সৈয়দ আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ, রোড-২৫, বাসা-২৭, ব্লক-ডি, সেকশন-১২, মিরপুর- এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫৩৯।

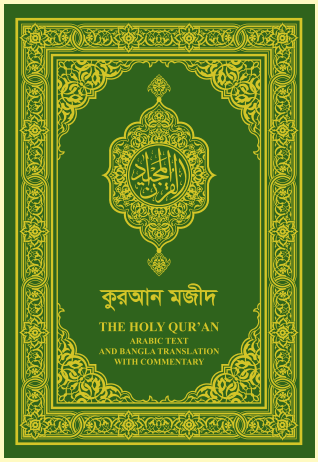

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে **পবিত্র কুরআন মজীদ** মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে **পবিত্র কুরআন মজীদ** সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে– ৫০০/- (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

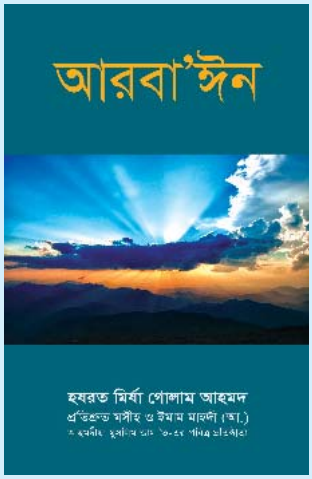

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর **"আরবা'ঈন"** পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সকল বিরুদ্ধবাদীর বিপক্ষে অকাট্য দলিল প্রমাণ সাব্যস্তের লক্ষ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ২২ জুলাই ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে লাগাতার চল্লিশটি বিজ্ঞাপন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে ২২ জুলাই ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ৪ (চার) পৃষ্ঠার একটি বিজ্ঞাপন আরবা'ঈন নং-১ আকারে প্রকাশ করেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আরবা'ঈনের খণ্ডগুলো খুবই সংক্ষেপে অর্থাৎ এক, দুই বা ক্ষেত্র বিশেষে তিন পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আকারে লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরবা'ঈনের প্রথম খণ্ড ছাড়া অন্য খণ্ডগুলো অর্থাৎ ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ডগুলো পুস্তিকার ন্যায় হয়ে যায়। তিনি (আ.) নিজেই বলেন, *'আমি নিজে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই আরবা'ঈন প্রবন্ধের (৪০) চল্লিশটি বিজ্ঞাপন পৃথক পৃথক প্রকাশ করব। কিন্তু এমন দৈব ঘটনাসমূহ সামনে আসল যে, এর বিপরীত পরিস্থিতি হল আর দুই, তিন ও চার নম্বর (খণ্ডগুলো) পুস্তিকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন এ পুস্তিকা (৪র্থ খণ্ড) সত্তর (৭০) পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে আর বাস্তবে আমার যা ইচ্ছা ছিল সেই বিষয় পূর্ণ হয়েছে।'*

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা বশিরুর রহমান সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুমুআর খুতবার বাংলা সংকলন 'খুতবাতে মসরূর'-এর ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

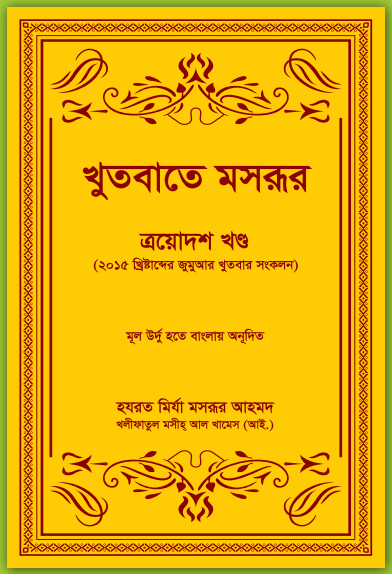

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে প্রথমবারের মত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে তাঁর প্রদত্ত ২০১৫ সালের জুমুআর খুতবাগুলোর অনুবাদ একত্রে গ্রথিত করে 'খুতবাতে মসরূর' ত্রয়োদশ খণ্ড পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্!

বাংলাদেশ জামা'তের আবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূর (আই.) এই পুস্তকটির বিনিময় মূল্য ২০০/- টাকা মাত্র ধার্য্য করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন যা জ্ঞানপিপাসু পাঠক সমাজের জন্য সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করার এক সুবর্ণ সুযোগ বয়ে এনেছে।

ধর্মীয় সাহিত্যের আঙ্গিকে হুযূর (আই.) প্রদত্ত খুতবাগুলো এক অমূল্য সম্পদ। অতএব, মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হুযূরের খুতবাগুলো পাঠে আমাদের সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, যাতে আমরা এটিকে নিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসে পরিণত করে এ থেকে লাভবান হতে পারি।

'খুতবাতে মসরূর' ত্রয়োদশ খণ্ড পুস্তকটি পাঠের সুফল আমাদের সমাজ-জীবনে দৃশ্যমান হোক আর খোদাপ্রেমী মানুষ দ্বারা সুন্দর হয়ে উঠুক এই ধরিত্রী, আল্লাহ্‌র সমীপে কায়মনোবাক্যে এ যাচনাই থাকবে।

বিনিময় মূল্য ২০০/- টাকা

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন!
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

New Vol. No. 81 | 10th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th November, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

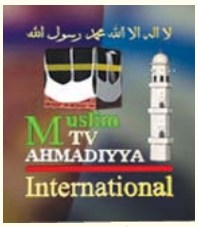

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)